পসারিণী

পসারিণী

সমরেশ বসু

নতুন সাহিত্য ভবন ঃ কলিকাতা-২০

রাম বসু

বন্ধুবরেষু

পশারিণী ১ অকাল বসন্ত ২৯
মদনের স্বপ্ন ৫২
ধূলি মুঠি কাপড় ৭৯ উরাতীয়া ১০৬
কিম্‌লিস ১৩১
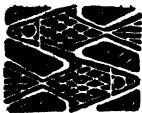
পশারিণী

সেই সময় সে এসে দাঁড়াল।

যখন চৈত্রের দুপুর ঝিমোচ্ছিল। যখন কলকাতা থেকে মাইল বারো দূরে উত্তরের এই স্টেশনটাও ঝিমোচ্ছিল এই দুপুরের মতোই। অবসন্ন, হাত পা এলিয়ে দেওয়া চোয়াল নাড়া, ল্যাজে মাছি না তাড়ানো অবসাদগ্রস্ত চোখ বোজা জানোয়ারের মতো।

যখন দক্ষিণের হাওয়াটা উঠছিল এলোমেলো হয়ে, আড় মাতলার মতো টিন্ শেডের কানায় ঘা খেয়ে হঠাৎ দমকা নিশ্বাসের মতো শব্দ তুলে যাচ্ছিল হারিয়ে।

যখন বড় গাছগুলির মাথা দুলছিল, স্টেশনের পুবের ঘন ঘন ঘাস কাঁপছিল আর আকাশ যেন উত্তাপের ভয়ে পাখা মেলা চিলগুলি-সহ হঠাৎ নেমে আসছিল খানিকটা। যখন স্টেশনটা যাত্রীহীন, প্ল্যাটফর্মের ঘুমন্ত কুকুরটা হঠাৎ ঘাড় তুলে কিসের গন্ধ শুঁকছিল বাতাসে, কুলিটা উঁকি মেরে দেখছিল দূরের সিগ্‌ন্যাল, স্টেশনমাস্টার নাকের ডগায় চশমা নিয়ে তাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন আপিসে। যখন বয়স ও অবয়বহীন, ব্যাগ ও ছোটখাটো কাঠের বাক্‌সো জড়ানো একটা মানুষের দলা স্তূপাকার দেহপিণ্ডের মতো পড়েছিল ওয়েটিংরুমের কোণে, ডাউন প্ল্যাটফর্মের লোহার বেড়ায় হেলান দিয়ে। পুবের ফোর্থ লাইনে অপেক্ষামান এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ারাশি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়।

তখন সে এল। ধীরে এসে দাঁড়াল আপ প্ল্যাটফর্মের কিনারে।

একবার দেখল উত্তরে আর একবার দক্ষিণে। তারপর পুবে, ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওই স্তূপাকার দেহপিণ্ডের দিকে। সেইদিকে সে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, একটু বেশী কৌতূহল নিয়ে।

চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা কঠিন। হতে পারে আঠারো কিংবা বাইশ, নয়তো আরো দু-বছর বেশী। হতে পারে এমনও, সে পঞ্চদশী বা ষোড়শী। রোগা রোগা গড়ন, সেজন্যে একটু লম্বা মনে হয়। একটু লম্বা, যেন হঠাৎ ছোট একটা মেয়ে কিছুটা বেড়ে উঠেছে। মাজা মাজা রং ফিতাহীন এলো খোঁপার রুক্ষ গোছাটা এত বড় যেন ওটার ভারে সে নুয়ে পড়ছে। দেহের সমস্ত গড়নটা যেন তার চুলেই কেন্দ্রীভূত। চোখ মুখ বলার মতো কিছু না, অথচ একটা না-বলার শান্ত দৃঢ়তার ছাপ তার মুখে। হাতে-কাচা একটা মোটা নীল শাড়ি সাদাসিদেভাবে তার পরনে, গায়ে সাদা জামা। পায়ে রোদে জলে ধোয়া পোড়া মান্ধাতার আমলের স্যাণ্ডেল। কাঁধে একটা ছিটের ব্যাগ। ব্যাগটা নতুন। হাতে গোটা কয়েক কাচের চুড়ি। নাম তার পুষ্প,—পুষ্পবালা। পুষ্পর চোখগুলি বড় বড়, কিন্তু করুণ। তাকে দেখলেই মনে হয় যেন, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে একটু গোছগাছ করে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসন্ন সকালে। দাঁড়িয়েছে আশা ও সংশয় নিয়ে।

ওভারব্রীজের উপর দিয়ে সে এল ডাউন প্ল্যাটফর্মে। এসে বসল একটা বেঞ্চিতে। বেঞ্চিটার দু-তিন হাত দূরেই, একটা মাল-ঠেলা ট্রলির উপর গায়ে গায়ে লেপটে পড়েছিল সেই মানুষগুলি। ট্রলির নীচেও দু-একজন। কয়েকজন রেলিংয়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। কোলে বগলে কাঁধে তাদের ব্যাগ, বয়াম, কাঠ অথবা টিনের ছোট বাক্স। মনে হচ্ছিল, সব মিলিয়ে দেহস্তূপটা নিশ্চল, নিঃশব্দ।

কিন্তু তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্তূপটা নড়ছে। কান পাতলে শোনা যায় চাকের মৌমাছির মতো একটা চাপা গুঞ্জন। একটা গোঙানি।

পুষ্প দেখল সেদিকে আড়চোখে, বসল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কান পেতে রইল ওই গোঙানি স্বরের মধ্যে যেন কোন গোপন কথা শুনছে, এমনি কৌতূহল তার বড় বড় চোখ দুটিতে। কোলের উপর টেনে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ব্যাগটা।

মনে হচ্ছিল গোঙানি। গোঙানি নয়, কথা। পুষ্পর পুরনো স্যাণ্ডেলের খস্‌খসানিতে কথাটা থামল। তারপর, চাপাস্বরে কেউ বললে—যেন পুষ্প শুনতে না পায়, কে রে বাইরন ওয়াটার ?

কিন্তু একাগ্রভাবে কান পাতায় শুনতে পেল পুষ্প। কিন্তু বাইরন ? এমন নাম শোনেনি জীবনে। তারপরের সব নামগুলিই আরও অদ্ভুত। বোধ হয় বাইরনেরই গলা শোনা গেল, একটা মেয়ে।

আইবুড়ো ?

বোঝা যাচ্ছে না।

কিরে নিমের মাজন ?

সম্ভবতঃ জবাব দিল নিমের মাজন, কি জানি। ভিকস্‌কে জিজ্ঞেস কর। ওসব বোঝে ও।

ভিকস বলল, কেন বাবা মরটন্‌কে জিজ্ঞেস করো না, বিক্রি বেশী, মানুষ চেনে।

মরটন বলল, তোদের যেমন শালা কথা। আজকাল আইবুড়ো আর নাইবুড়ো বোঝা যায় ?

তবে ভদ্দরলোক বলে মনে হচ্ছে।

আবার প্রথম গলাটাই শোনা গেল, এই জন্যেই তো বলছিলাম। ছাখ

না, দু-পয়সার মাল যদি বিকোয় দুপুরের ঝোঁকে। কইরে দার্জিলিংয়ের নেবু।

বোধ হয় এবার জবাব দিল লেবুই। লেবু খাওয়ার মতো চেহারা মনে হচ্ছে না—তারপর যা বলছিলি তার কি হল বল্।

ঢিপঢিপ করছিল পুষ্পর বুকের মধ্যে। এত জোরে ঢিপঢিপ করছিল যে, বুকের কাছে আঁচলটা কষে টেনে দিতে হল তাকে। চোখে ত্রাসের ছায়া। তবু কৌতূহল, আর তার মাজা মাজা মুখে হাসি লজ্জা ও ভয়ের মিলিত বিচিত্র ছাপ পড়ল।

আবার একটা ভাঙা ও চাপা উৎসুক গলা শোনা গেল, তারপর কি হল হরেন, থুড়ি, পারিজ সুইট? সুইটি না কি?

জবাবে আবার সেই গোঙানিটা শোনা গেল, তারপর আবার কি, ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেললুম। মেদিনীপুর কলেজে ভর্তিও হয়েছিলাম মাইরি। কেঁচে গেল।

কি করে?

যেমনি করে কেঁচে যায়। পয়সা নেই। বাবা বললে, খুব হয়েছে। এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিগে যা। ম্যাট্রিক পাশ হয়েছিস, বংশে এই প্রথম। আবার কি! শা—লা!······

শালা কেন?

কে দেবে চাকরি। ভিকসও তো ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিরে কেষ্ট, বল্ না তোর চাকরির কথা।

ভিকস্ ভেংচে উঠল, কেন আবার কেষ্ট কেন, ভিকস্ বলা যায় না? ম্যাট্রিক পাশ আবার কিসের? সে তো করেছিল কেষ্ট রায়। মরে ভূত হয়ে গেছে কবে। এখন ভিকস্! সর্দি, কাশি, মাথা ধরা···এই চাপাস্বরের গোঙানির মধ্যেই সমবেত

গলার একটা হাসি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চাপা পড়ে গেল। যেন পোড়ো বাড়ির রুদ্ধ অন্দরে দমকা হাওয়া পাক খেয়ে মুখ গুঁজে হারিয়ে গেল।

আবার, হ্যাঁ ওই যে কালি বিক্কিরি করে চশমাওয়ালা ছোঁড়াটা, ও নাকি গেজেট।

কে, দার্জিলিংয়ের নেবু বুঝি? গেজেট কি রে শালা। বল্ গ্রাজুয়েট্।

দার্জিলিংয়ের লেবু তাতে লজ্জা পেল না। বলল, কি জানি। মুখে না এলে, জিভটা তো আর আঙুল দিয়ে নাড়া যায় না!

পাগল! কিন্তু আসামের লেবু তো দার্জিলিংয়ের ঠিক বলতে পারিস্?

হ্যাল্হেলে গলায় হেসে জবাব দিল, তো ব্যাওসা চালাতে হলে···। যা বলছিলুম, গেজেটও শালা হকারি করে! আর কী রকম ভদ্দরলোক দেখিছিস ছোঁড়াটাকে। নির্ঘাত কেটে পড়বে একদিন।···

কথাগুলি যেন গিলছিল পুষ্প। সে বসেছিল পশ্চিমদিকে মুখ করে। কিন্তু চোখে তার ওদেরই কথার ছায়া। সব মিলিয়ে তার শিশুর মতো মুখে কৌতূহল ও চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। বিষাদে ভরা চোখ দুটিতে তার চাপা হাসির আলো পড়ে দুষ্টু মেয়ের ভাব হয়ে উঠেছে।

আবার একটা নতুন গলা শোনা গেল, আমিও শালা কেলাস্ এইট্ অব্দি পড়েছিলাম।

মাইরি?

কেন, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

না, বলি কোন্ ইস্কুলে?

কেন, ঢাকা শহরের হাইস্কুলে?

বটে ? তোরা তো আবার বিক্রমপুরের জমিদার ছিলি, না ?
চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আর একজন, হ্যাঁ জমিদার। এখন চানাচুরদার হয়েছে।
আবার একটা চাপা হাসি ও ক্রুদ্ধ গলার গুঞ্জন উঠল। চানাচুরদারই বলে উঠল, আমি জমিদার ছিলাম না, আমার মেসোমশায় ?
ও-ই হল। মায়ের বোনের বর তো। আ হা হা উঠছিস কোথায় ?
না হয় শালা এইট্ অব্‌দিই পড়েছিস্। হল তো ? বোস্ এখন।
আর একটা নতুন গলা, আমি তো শালা জীবনে বই ছুঁইনি।
আমিও না।
আমি তো বই দেখলে কেটেই পড়ি শালা !
আর মেয়ে দেখলে জমে যাস্।
আবার হাসি। তারপর শান্ত গম্ভীর গলায় একজন বলল, থাম্ থাম। হরেন তারপর ?
হরেন বলল, তারপর আবার কি ? বিয়াল্লিশে দেশ স্বাধীন করতে গেলুম। গুলি খেয়ে ঠ্যাংটা গেল। তারপর লাঠি বগলে দিয়ে নরক ঘুরলে ঘুরতে এই ট্রেনের হকারি। ক্ষণিক নিঃশব্দ। শুধু ফোর্থ লাইনের বেকার এঞ্জিনটার সোঁ সোঁ।
তারপর আবার, মাইরি, আমাকে আবার লোকে গলায় মালা দিয়েছিল, যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলুম। আর এ লাইনের পুরনো হকাররা প্রথম প্রথম পাছায় লাথি মারত।
পুষ্পর শান্ত মুখের হাসিটুকু হঠাৎ উধাও হল। ব্যাকুল অথচ চাপা ব্যথায় ভরে উঠল মুখটা। ফিরে তাকাতে গিয়েও পারল না। শুধু কাত হয়ে পড়ল তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা।

কে আর একজন বলল, আমার বৌটা মরে গেল তাই। নইলে—
একটা বিদ্রূপাত্মক কচি গলায় শোনা গেল, আমার তো বাপ মা সবই মরে গেল দাঙ্গায়।
বৌ গেলে বৌ হয়। বাপ মা—
আমার গ্লাস ফ্যাক্টরির চাকরিটা খেয়ে দিল শালা পালবাবু!
হঠাৎ সমস্ত দেহস্তূপটা থেকে অভাব, অভিযোগ, ব্যথা, ব্যর্থতা ও ক্রুদ্ধ একটা মিলিত গুঞ্জন উঠতে লাগল। যেন একনাগাড়ে উড়ে চলেছে এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। তারা কেউ বাপ মা বৌ হারিয়েছে, জমি-ছাড়া হয়েছে, ছাঁটাই হয়েছে কারখানা থেকে, বিতাড়িত হয়েছে ঘর থেকে। কাউকে খাওয়াতে হয় গাদা গাদা পোষ্যদের, জোগাতে হয়, নয়তো স্রেফ শালা সিনেমা আর নেশা, মাইরি!
পুষ্পর চাপা বুকটার মধ্যের কি যেন কলরব করে উঠল ওদের মতো। চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্ করে আর্তনাদ করে উঠল, তার বুকের মধ্যে; বুড়ী মা, ছোট ছোট ভাই বোন, অনাহার, পীড়ন, অপমান। বিয়ে, বর, ঘর ও শান্তির স্বপ্ন! একটু ভালবাসা, এক ছিটে সোহাগ……
একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি চমকে দিল চৈত্রের দুপুরের ঝিম-ধরা স্টেশনটাকে। যেন গলা টিপে ধরল সমবেত গোঙানি-স্বরটা। চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ। তারপর শোনা গেল হাসির চেয়েও তীব্র শ্লেষভরা কথা, এই, এই হয়েছে। সব ব্যাটার সর্দি ধরে গেছে। লাও, ভিকস।
ভিকস দোস্ত, ভিকস্। সর্দি, কাশি, মাথা ধরা।
আর একজন, আই কিওর, আই কিওর। লাগাও, চোখের জল আর পড়বে না, মাইরি বলছি।
আবার সাড়া পড়ল হাসির। আটকে-পড়া ঘূর্ণি জলের আবর্ত ছাড়া

পেল। এবার কড়া হাসি চড়ল আরও। নিরাশার পাগলা হাওয়া সঙ্গী পেল অনেকগুলি।

আশ্চর্য! পুষ্পর চাপা-পড়া অস্থির বুকটাতেও হুস্ করে হাওয়া লাগল একটু। সে শান্ত হল, বিপথ থেকে পথে ফিরল হৃদয়। একটু হাসিও যেন দেখা দিল চোখে। খুলে পড়েছিল শুধু চুলের গোছাটা। সেটাকে বাঁধল আবার টেনে। কী যে চুল!

দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের হুইশল্। মাল-ঠেলা ট্রলিটা খালি করে ভেঙে গেল দেহস্তূপটা। যেন চাকের মৌমাছি সব খালি করে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথমে ক্রাচ্ ঠুকে ঠুকে সামনে এল হরেন, পারিজ সুইট। একটা বুক-খোলা, গায়ে-ছোট জামা আর সরু পাজামা। দূরে তাকিয়ে দেখল গাড়ি, তারপরে মহিলা প্যাসেঞ্জারের চেহারাটা। অর্থাৎ পুষ্পকে। যদি দুটো পারিজ লজেন্স্ কাটে। কিন্তু না, কোন আশা নেই। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আঁচল গড়ের মাঠ। কেবল তার খোঁড়া চেহারাটার দিকেই মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন জীবনে আর খোঁড়া দেখেনি কোনদিন। নেহাৎ ভদ্রলোকের মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পুষ্প। তারপর আর একজন। একজন একজন করে সবাই দেখল মাত্র একটি প্যাসেঞ্জারকে। বায়রন ওয়াটার, ভিকস্, মরটন, চানাচুর, পানবিড়ি, ফাউন্টেন পেন ···সকলে। এই দুপুরের ঝোঁকে যখন অনেক দেরিতে দেরিতে আসে ফাঁকা গাড়ি, তখন ছুটকো খদ্দেরকে তারা এমনি শিকারী বাজপাখির মতো দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু মস্ত চুপড়ির মতো খোঁপাওয়ালা মেয়েটা যে কিছু কিনবে, এমন আশা হল না তাদের।

ইতিমধ্যে এল আরও দু-একজন প্যাসেঞ্জার। এল গাড়ি। দুপুরের

লোকাল ট্রেন। অধিকাংশ দরজাগুলি খোলা, কামরাগুলি ফাঁকা। ভিখিরী অন্ধ আর খঞ্জরাই একমাত্র যাত্রী। পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে দেদার। সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। তারাও ঝিমুচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে। কেউ বই পড়ছে নয়তো গান ধরেছে গুন্‌গুন্‌ করে। এর মধ্যেই কোন কামরা থেকে ভেসে আসছে একঘেয়ে গল্প, 'অন্ধ হয়ে ভাই কত দুঃখ পাই……'। সে নিশ্চয় খাঁটি অন্ধ। নইলে চেঁচাত না ফাঁকা গাড়িতে। আর কামরায় কামরায় হকারদের চিৎকার নেই, দলে দলে গুলতানি চলছে।

কে একজন চিৎকার করে বলল, কইরে, প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা বসে রইলি যে?

জবাব এল, প্যাসেঞ্জারই নেই, কি হবে এখন গিয়ে?

প্যাসেঞ্জার কি আকাশ থেকে পড়বে? ছুটির সময় হল, শিয়ালদা চল্। চল্ যাই।

প্রত্যেকটি কথা কান পেতে শুনল পুষ্প। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রত্যেকটি হকারের চেহারা। প্রত্যেকের চলা বলা হাসি, তাদের কথার ভঙ্গি। তারপর দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে একটা কামরার হাতল ধরল। ধরে উঠবে গাড়িতে, তেমন শক্তিটুকুও যেন নেই হাতে। এখান থেকে শিয়ালদা, মাত্র বারো মাইল যার দূরত্ব। তবু সে যেন কতদূর। কত দুঃসাহসের যাত্রা। বুকের মধ্যে ভয়ের ধুকপুকুনি, ধড়ফড়ানি। আর এই মানুষগুলি, উস্কো-খুস্কো চুল, এবড়ো-খেবড়ো মুখ, ছেঁড়া ময়লা জামা। কাঁধে বগলে যাদের চলন্ত দোকান ছুটন্ত ট্রেনের সংকীর্ণ পাদানির বিপজ্জনক পথে পথে চলেছে ছুটে। এত শক্তি কোথায় পুষ্পর দেহে।

কিন্তু সময় নেই ভাববার। বাঁশি বাজাল গার্ড। বাঁশি বাজল গাড়ির।

তারপর কয়েক মুহূর্তের থেমে যাওয়া চাকাগুলি একটা তীব্র আর্তনাদ করে এগিয়ে চলল। যেন পুষ্পর সমস্ত সংশয় ও ভয়ের দড়িটাকে ছিঁড়ে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল তাকে শব্দটা। স্টেশনটা আবার ঝিমুতে লাগল পেছনে।

যেতেই হবে। এই পথের যাত্রা ছাড়া জীবনে আর কোন যাত্রা নেই। জীবনের সমস্ত যাত্রা আজ ঠেলে দিয়েছে এই পথে। মানুষের জীবনে তার পেছনটা শুধু ঝিমোয়, ওই ফেলে-আশা স্টেশনটার মতো। পুষ্পর পেছনটা কেবলি তাড়া করে। কখনো দারুণ অভাবের বেশে, অপমানের বেশে। কখনো ঘৃণ্য লোভের মূর্তিতে, তুরন্ত কান্নার বন্যায়। সুদীর্ঘ, বিরলযাত্রী কামরার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল পুষ্প। খোলা দরজা দিয়ে তুর্বার হাওয়া এসে বিস্রস্ত করে দিল তার শাড়ির আঁচল আর চুলের গোছা। তু-হাতে ব্যাগটি বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চল হয়ে তবু বসে রইল পুষ্প। পুষ্পবালা, ঢাকা জেলার কাছে বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়ে। তবু তার বুক চাপা ভয়ের পাথর, ব্যাকুল সংশয়। সে পারবে কি? পারবে তো?

চোখের উপর ভেসে উঠল বিধবা মায়ের মুখ। সে মুখ মেয়ের প্রতি নির্দয়, অথচ মমতাময়ী। সেই মুখটি চোখে ভাসল আর মন বলল, পারব। অপোগণ্ড ভাইবোনগুলির মুখ মনে পড়ল, আর মন বলল, পারব। তার নিজের ক্ষুধাকাতর পুষ্ট ও অপুষ্টতায় মেশা এই দেহ ও মন দাঁড়াল তার সামনে, মন বলল, পারব পারব। তার এই সুদীর্ঘ চুলের গোছা যতই এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝাপটা মারতে লাগল, ততই তার শিরদাঁড়া থেকে পায়ের দিকে একটা অদৃশ্য শক্তি নুয়ে-পড়া দেহটাকে সোজা করে দিয়ে ছুটে এল পারব পারব বলে।

ওই তো কয়েকজন যাত্রী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার অতিকায় চুলের দিকে। চুলের ওইটুকুই তার রূপ। তার সুখ দুঃখ অপমান। বাবা বলত আদর করে, 'আমার এলোকেশী'। এই চুল একদিন আদর দিয়েছে, সোহাগ কেড়েছে। হাতিয়ে সুখ, আঁচড়ে দিয়ে সুখ, বেঁধে দিয়ে আনন্দ। অনেক সঙ্গিনী শুধু খেলার জন্যে দশটা করে বিনুনি বেঁধে চুড়ো বেঁধে দিয়েছে শিবের মতো! সাপের জটার মতো দিয়েছে জড়িয়ে। আজও এ চুল মন টানে, চোখ টানে। আর পুষ্প ভাবে, এ চুল গলায় বেঁধে ঝোলা যায় না কড়িকাঠে? এ চুলে একটি দিয়াশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে দিলে দরকার হবে না চিতার কাঠ সাজানোর।

তবু তো এ চুল মুড়িয়ে দিতে হাত উঠেও ওঠেনি। আগুন জ্বালাতে নিভে গেছে দীপশলাকা। প্রাণটাকে টিপে শেষ করতে গিয়েও থাবা গুটিয়ে এসেছে আপনি। মৃত্যু যে বাসা বাঁধেনি মনের কোথাও। সে তাকে ঠেলে দিয়েছে এই পথে। সে পারবে না কেন?

এই গরমের দুপুরবেলা যখন আপনার গলা শুকিয়ে আসছে। কিশোর গলা শুনে চমকে উঠল পুষ্প। দেখল একটা ছেলে, কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার স্বরে চিৎকার করছে। যখন আপনার ঘুম আসছে আর শরীরটা ভার লাগছে, তখন মুখে পুরে দিন এক স্লাইজ মরুটনের টকমিষ্টি লজেন্স্। মুখ ভরে উঠবে রসে, নতুন এনার্জি আপনাকে ফ্রেশ করে তুলবে, না হলে পয়সা ফেরত। এক স্লাইজ দু-পয়সা, দু-স্লাইজ চার পয়সা, ছ-স্লাইজ দশ পয়সা। বলুন কোন্ দাদাকে দেব, বলে ফেলুন।

কিন্তু যাত্রীরা নির্বিকার। কেউ এক আধবার তাকিয়ে দেখল, শুনল কেউ কেউ, ঝিমোতে লাগল অধিকাংশ। দুপুরের যাত্রী, ছাত্র-

কেরানীর ভিড় নেই। খুচরো ব্যবসাদার, বেকার, উমেদার আর ভিক্ষুকের ভিড়।

এই যে, এখানে একটা দাও।

ছেলেটা ফিরে তাকাল আর হাসির রোল পড়ল একটা। আর একজন মরটন লজেন্সেরই হকার তাকে ডাকছে। বলল, দে না একটা, কেউ তো নেবে না, আমিই নিই।

দেখা গেল, মরটন, পারিজ, বায়রন, প্রগতিশীল কাগজ, ফাউণ্টেনপেন, চানাচুর, সব একসঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে কামরার আর এক কোণে।

ছেলেটাও হাসল। তবু বলল, বলুন আর কারো চাই। শুধু শুধু ঝিমুবেন না, তেষ্টায় কষ্ট পাবেন না। এক শ্লাইজ আধঘণ্টা আপনার গালে থাকবে।

একজন ফিরে তাকাল। বোধহয় বুড়ো উমেদার। ছেলেটা বলল, আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা স্বাদে গন্ধে ভরে রাখবে আপনার মুখ।

এক ঘণ্টা? লোকটি বলল, দেখি একটা।

ছেলেটি বলল, দুটো দিই?

একঘণ্টা থাকে তো গালে?

ছেলেটা বলল, না চিবুলে সোয়া ঘণ্টা থাকবে। পাথর দাদা পাথর।

লোকটি কিনে ফেলল দুটো। আর কারো চাই, বলুন?

সে আবার লজেন্সের গুণগান আরম্ভ করল। আরও সুন্দর ভাষায়, জোরালো ভাষায়। আরও তিনটে বিক্রি হল।

পুষ্প জানে না, অজান্তেই তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। সে ভারি খুশি হয়েছে ছেলেটার কৃতকার্যতায়। হঠাৎ ছেলেটা তাকেই জিজ্ঞেস করছে, 'আপনাকে দেব এক শ্লাইজ দিদিমণি, মরটনস্ সুইট্।

বিস্মিত লজ্জায় চমকে পুষ্প ঘাড় কাত করে ফেলল। ছেলেটা কয়েক লাফে হাজির হল তার কাছে। পুষ্পর বুকের মধ্যে ঢাক বাজছে। পয়সা? পয়সা আছে তো? আছে। সাত পয়সা আছে। পয়সা বার করতে গিয়ে পুষ্প বারবার ছেলেটাকেই দেখছে। বোতামহীন, হাট-করে-খোলা জামার ফাঁকে হৃৎপিণ্ডটা থর্থর্ করে কাঁপছে ছেলেটার। ঢোঁক গিলছে, কাশছে আর পিচ্ পিচ্ করে থু থু ফেলছে খোলা দরজা দিয়ে। ছোট্ট মুখটিতে উত্তেজনা, বিন্দুবিন্দু ঘামে ভরা। আর হলদে চোখ দিয়ে দেখছে পুষ্পর চুলেরই গোছা। সমীহ করে দেখছে, দিদিমণি বলে ডাকছে। পুষ্প ওদের খরিদ্দার।

সব মিলিয়ে যেন অনেকগুলি পোকা কুরে কুরে খেতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কেন, কেন পুষ্পকে ওরা ওদের সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। পুষ্প যে ওদেরই মতো এসেছে ব্যাগ কাঁধে ট্রেনের মধ্যে। দু-পয়সা দিয়ে লজেন্সটা ঘামে-ভেজা মুঠির মধ্যে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল সে, সারাদিনে কত বিক্রি হয়?

ছেলেটা একটু অবাক হল। একে খরিদ্দার তায় মেয়ে। ছেলেটা হঠাৎ দয়ার প্রত্যাশায় করুণ হয়ে উঠল। পুষ্প বুঝল না, ছেলেটা করুণার জন্যে তাকে মিছে কথা বলল। বলল, কিছু না।

সারাদিনে খেটে কিছু পাই না, জানেন। কয়েক পয়সা হয়।

হতাশা ঘিরে আসতে লাগল পুষ্পর মনে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা এমনি করে ঘোর, রেল কোম্পানী কিছু বলে না?

কী আর করবে। মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়, হাজতে পুরে রাখে।

কেঁপে উঠল পুষ্পর বুকের মধ্যে। বলল, টিকিট কাটলে হয় না?

ছেলেটা বলল, কিসের টিকেট? মান্থলি? মান্থলি তো প্যাসেঞ্জারের। আমাদের লাইসেন্স চাই, ভেণ্ডারস্ লাইসেন্স। কোথায় পাব।

গবরমেণ্ট তো দেয় না আমাদের।

মান্থলি থাকলেও ধরে নিয়ে যায়। আর একটা লজেন্স দেব আপনাকে?

চমকে উঠল পুষ্প। বলল, অ্যাঁ? না আর চাই না।

ছেলেটা চলে গেল। আর পুষ্প চটকাতে লাগল লজেন্সটা হাতের মধ্যে। তবে? লজেন্সটা পড়ে গেল হাত থেকে। থাক্। তবে? পুলিস হাজত ও অপমান?

এ অপমান। কিন্তু তার যৌবন ও হৃদয়ের অপমান? সেই ভয়ংকর ঘোর অন্ধকারের রাক্ষসটা? অদৃশ্যে যে রেখেছে তাকে চোখে চোখে? তবুও পারল না পুষ্প। শুধু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে দাঁড়িয়ে রইল শিয়ালদা স্টেশনের জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে। ব্যাগটিকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। তার পশরার ব্যাগ। থরে থরে এনেছে সাজিয়ে। আর হকারের দল তাদের পশরা দেখিয়ে সেধে সেধে গেল তাকে তার মূঢ় মুখের সামনে।

সন্ধ্যাবেলা একটা ভিড়বহুল কামরাতে উঠে পড়ল পুষ্প। আপিস-ফেরতা মানুষের ভিড়ে গিজ্‌গিজ্ করছে সমস্ত কামরাটা। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল পুষ্প। বুকটা কাঁপছে থরথর করে। কাঁপুক। তবু, বলবে, দেখাবে তার পশরা। দেখুক সকলে, সে একজন মেয়ে হকার।

হঠাৎ একটি যুবক কেরানী উঠে দাঁড়াল। চশমা-পরা চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তার পুষ্পর চুলের দিকে। একটু বিরক্তও হল বোধ হয়। কণ্ঠে কিছু সমীহ। বলল, বসুন আপনি।

চমকে উঠল পুষ্প। হকার নয়, যাত্রিনী। মহিলা-যাত্রীর সম্মান ও কষ্ট লাঘব করা। পারল না, বসে পড়ল পুষ্প। বসে রইল মাথা নীচু

করে। নারীর সম্মান। কিন্তু জীবন এমনই শক্ত চিড়ে যে, সে শুধু সম্মানের জলে ভেজে না। ক্রাচ্ বগলে সেই পারিজ সুইট হরেন তখন বলছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলে গেছে স্যার। হাওয়া ঠাণ্ডা না হতেই, আবার ড্রাম বাজানো হচ্ছে। আপিসে এখনো অনেক হিসাব কষতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, ভাবুন, পারিজ সুইট্ মুখে রাখুন। পারিজ কোকো সুইট্, চার পয়সা প্লাইজ, বাট ইকোয়েল টু ওয়ান কাপ কোকো।......

কে একজন বলল, এম-এল-এ-রাও নাকি অবাক হয়ে হকারদের বক্তৃতা শোনে। আর একজন যোগ করল, প্রফেসাররাও হার মানে।

ততক্ষণে অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে পুষ্পর। নিজের স্টেশনে নেমে, ঝাপসা চোখে অন্ধকার গলি পথে বাড়ির দিকে চলল সে।

কিন্তু আবার এল তার পরদিন। আবার দেখা হল সেই দলটার সঙ্গে। ওরা আবার বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। বোধ হয় কিছু জুটেছে মেয়েটার কলকাতায়। মেয়ে হলেই নাকি শালা একটা কিছু জুটে যায়, মাইরি।

তারপর সন্ধ্যাবেলা, শিয়ালদহের যাত্রী ও হকারের দল অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সবাই দেখল, ভিড়াক্রান্ত গাড়িতে একটা মেয়ে, অল্পবয়সী ভদ্রলোকের মতো দেখতে একটা মেয়ে, কী যেন বলছে। হরেন ক্রাচ্ বগলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে তার ভিক্স, দার্জিলিং-এর কমলালেবু, মরটন, বাইরন, প্রগতিশীল মাসিক বিক্রেতার দল।

তারা সবাই মিলে হাঁ করে রইল।

কেবল ভিক্স বলল, নির্ঘাত ভিক্ষে চাইছে। ভেংচে বলল চাপা গলায়, দেখুন, আমার স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নিয়ে—

পুষ্পর হাতে তখন ছোট ছোট কয়েকটা ন্যাকড়ার পুতুল জুলজুল করে ঝুলো দোলাচ্ছে। আর একটা চাপা সরু মেয়েলী গলা: আমার নিজের হাতের তৈরি, ন্যাকড়া আর তুষের তৈরি, উপরে রংকরা। দাম দু-আনা করে………

গলাটা কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসছে, একটু বা চড়ছেও। যাত্রীদের শুধু বিস্ময়টুকু কেটে গিয়ে, বিস্ময়, লজ্জা, বিরক্তি, করুণা ও হাসির মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠতে লাগল।

ছি ছি, কী কাণ্ড!

এ সব কি হচ্ছে আজকাল? একটা অতবড় মেয়ে।……

এখনই কি, আরো কত দেখতে হবে।

উঃ কী অবস্থা ভাই দেশের।

বিবাহিতা!

নাঃ! কি জানি, হবে হয়তো! কিন্তু সিঁদুর তো নেই।

কেবল দার্জিলিংয়ের লেবু হরেনের কাছে চাপা হুংকার দিয়ে উঠল, ওরে শালা, এ যে হকারনি দেখছি।

হরেন বলল, তাই তো।

মরটন বল, সর্বনাশ করেছে।

কে একজন বলল, কোন তেল কোম্পানির শো কেসে বসে থাকলে চুল দেখিয়ে মাইনে পেত।

সত্যিই সর্বনাশ! এমন একটা মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কল্পনা করেনি তারা কোনদিন। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু, এ রকম একটা মেয়ে। মেয়ে হকার। সত্যি সর্বনাশ। আর সেই সর্বনাশের

আশঙ্কায় তাদের মুখগুলি এঁকে বেঁকে তুমড়ে কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। মলম মাজন, রেলেঘোরা আজব ডাক্তার ডেন্টিস্ট থেকে শুরু করে সবাই দেখল মেয়েটাকে, অনাগত এক পথ-দ্রষ্টাকে। তাদের সকলেরই মুখগুলি বিরূপ হয়ে উঠল।

হরেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, সেই মেয়েটা।

চানাচুর বলল, নিশ্চয়ই সাত-ঘাটের-জল-খাওয়া মেয়ে।

আর একজন মন্তব্য করল, নইলে আর রেলে এসেছে হকারি করতে। কতবড় বুকের পাটা।

মাজন প্রায় চেঁচিয়েই বলল, বুকের পাটা আবার কিসের? বুকের বালাই শালা কবেই খেয়ে বসেছে। কোনদিন দেখব, ছুঁড়িটাই মাজন বিকোচ্ছে।

ওইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বড় ভয়। ওই নজরেই তারা দেখে সমস্ত ঘটনাটা। নতুনেরা পুরনোদের কাছে অনেক লাথি ঘুষি খেয়েছে। পরে তারা একত্রিত হয়েছে। বাধ্য হয়েছে পরস্পরে হাত মেলাতে। আর এই মেয়েটা এসেছে আজ খদ্দেরদের মন ভোলাতে। তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে। খদ্দেরের মন আর মেয়েমানুষ। এই ভেবেই তাদের বিবেক, বুদ্ধি, মন কুঁকড়ে গিয়ে হঠাৎ প্রতিশোধের জন্য ভয়ংকর হয়ে উঠতে চাইল।

কেরানী ও ছাত্রদের সন্দেহপরায়ণ মন দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে তুলতে লাগল সকলের মন। দোলার ঝোঁকটা অবিশ্বাসের দিকেই যেন বেশী। গরিব? হ্যাঁ গরিবই মনে হচ্ছে। আটপৌরে শাড়ি আর কাচের চুড়ি ক-গাছা। চুলগুলিই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু না, মেয়েটা ভালো হওয়া তো সম্ভব নয়। একেবারে রেলে হকারি।

যা দিনকাল। বয়সও তো নেহাৎ কাঁচা। যাকে বলে উঠ্‌তি বয়স। এই বয়সে একেবারে পথে, গাড়িতে, ভিড়ের মধ্যে! কেমন যেন ঝাপসা লাগছে ব্যাপারটা।

মাথাটা উঠছে আস্তে আস্তে পুষ্পর। একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটছে গলায়। চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু আধা অন্ধ। কেবল ভিড়ের উপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, পরিষ্কার দেখছে না কাউকে। বলছে, ন্যাকড়াটা বেশ মোটা আর শক্ত। ছিঁড়বে না সহজে। বাড়ির ছেলেপুলেরা······

বলছে, দেখছে শুনছে সবাই, কিন্তু কেউ নিচ্ছে না। যেন নিতে পারাটাই একটা মস্ত ব্যাপার। চাকরি ব্যবসা করে না, অথচ রোজগার করে এরকম একশ্রেণীর ভদ্রলোকের মতো যাত্রীও দু-একজন ছিল। তারা টিপ্পনি কাটল, অর্থপূর্ণ গলায় বলল, মন্দ নয়, কী বলিস্। তবু শালা দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

শুধু একজন হাত বাড়িয়ে একটা পুতুল নিল। পরনে ময়লা হাফ প্যাণ্ট, তেলকালি-মাখা নীল জামা। মুখও তেলমাখা। গোঁফজোড়াটা বিরাট। কোন তেল-কলের মিস্তিরি মজুর হবে হয়তো। অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল গম্ভীর মুখে। দেখে পয়সা দিল।

অমনি পুষ্পর সঙ্গে ওই মানুষটাও দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল একটা। শোনা গেল, হুঁ, বুঝলুম! কিন্তু মানুষটি নির্বিকার।

পরমুহূর্তেই একটা চিৎকার, ভিকস্। ভিকস্ স্যার। আপনার মাথা সাফ হয়ে যাবে, জ্যাম ছেড়ে যাবে।

আই কিওর স্যার, চোখের গণ্ডগোল কাটবে,······

অ্যাণ্ড্ পারিজ স্যুইটস্! আজেবাজে চিন্তা থেকে আপনার মনকে একমুখো করুন!······

দার্জিলিংয়ের নেবু!······চানাচুর!······সাড়েচার ভাজা!··· ধূপ!······

বায়রনের জল !……কে, পি, দে-র মলম।……
গুলি ! সীসের নয়, তানসেনের।

কামরাটার চারদিকে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল পড়ে গেল। ডুবে গেল পুষ্পর গলা। সে অবাক হয়ে তার ভীত করুণ চোখ মেলে দেখতে লাগল চারদিকে। একটা কামরাতে এতগুলি হকার! একসঙ্গে? কেন?

কাছ থেকেই কে একজন কেশো গলায় হেসে বলে উঠল, ওই দেখুন যারা চেনে আর জানে, তারা ঠিক ব্যবস্থা করছে। দু-দিনে তাড়িয়ে ছাড়বে মশাই……

শোনার দরকার ছিল না। তার আগেই বুঝল পুষ্প। সমস্ত চিৎকার-গুলি তার কানে আর বুকে এসে বিঁধিয়ে পিটিয়ে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল। অন্ধকার হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তাকে ওরা তাড়িয়ে দিতে চায়। সেই মানুষগুলি।

গাড়ি ছাড়ল। স্টেশনে নেমে নেমে সে যে কামরায় গেল, একই চিৎকার। চিৎকার আর ক্রুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষে পুষ্পকে খুঁচিয়ে মেরে দিশেহারা করে তুলল।

বাড়ি ফেরার পথে, মফস্বলের অন্ধকার গলিটাতে থমকে দাঁড়াল পুষ্প। বুকে মুঠিকরা হাতে একটি দু-আনি, একটি পুতুলের দাম। সেটিকে বুকে চেপে সে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল নিঃশব্দে। বহু ভয় ও সংশয় পেরিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু এমন ভয়ংকর বাধার কথা মনেও আসেনি। না, সে পারবে না, পারবে না।

তবু আবার এল পরদিন। দূরের এই স্টেশনটা আজও ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু সে আসবামাত্র ডাউন প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা চিৎকার ভেসে

এল, পুতুলের মা এসেছে রে।

দেখতে দেখতে সকলেই দাঁড়াল উঠে। সর্বাগ্রে ক্রাচ বগলে হরেন।

একজন বলল, পুতুলগুলি মরা না জ্যান্ত, জিজ্ঞেস কর্।

আর একজন বলল, জিজ্ঞেস কর্ তো কার পুতুল ?

না, নিজেরগুলো ঘরে রেখে এসেছে।

সেগুলোকেও নিয়ে এলেই হত।

পুষ্পর বুকটা ছিঁড়ে গেল ওদের ইঙ্গিতে। তার জ্যান্ত পুতুল। পুতুলের মা ! তার সারা শরীরের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায়, অনেকদিন কান্না চিৎকার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। অনেকদিন অজ্ঞান্তে তার বুকে ঠোঁটে অসহ্য বেদনায় ও আনন্দে বিচিত্র শিহরণের স্পর্শে তারা মাতাল করে গেছে পুষ্পকে। সে ছিল যৌবনের স্বপ্ন। আঠারো বছরের পুর্ণ যৌবনে সে পুতুলের মা, হকারনি। মেয়ে নয়। শাঁখা সিঁদুরের আবির্ভাব ঘটেনি। পুতুলের জন্মদাতা আসেনি কোনদিন ঘরদোর-আশ্রয়ের ঢোলক-কাঁসি বাজিয়ে।

রাগ হল না। বিষণ্নভাবে হাসল পুতুলের মা পুষ্প। পুতুলের মা-ই। তার নিজের হাতের পুতুল। কিন্তু সে ভয় পেল না। পেলে তাকে ফিরে যেতে হবে নরকে। পঙ্ক-অঙ্কে নিতে হবে আশ্রয়। তার সে মরণের পর কেউ পুতুলের মা বলেও বিদ্রূপ করবে না।

মাথা তুলে ফিরে তাকাল সে ওদের দিকে। কিন্তু ওরা টিটকিরি ও বিদ্রূপের জেদী ও চাপা চিৎকারে ভেঙে পড়ল। শোনা যায় না, তাকানো যায় না ওদের ছেঁড়া জামা আর রোদে পোড়া নিষ্ঠুর মুখ-গুলির দিকে।

অথচ এই হরেন বিয়াল্লিশের গুলি-খাওয়া মানুষ। ভিকসও নাকি ছেচল্লিশে জেল খেটেছে। ওদের অনেকের পিছনে অনেক ইতিহাস।

শুধু পুষ্পর মধ্যে এক কলঙ্কিনী শত্রু-মেয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু খুঁজে পায়নি। লাইন পেরিয়ে পুষ্প অনেকখানি দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

কেবল প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা, গোঁফ মুচড়ে শান্ত গলায় বলল, শত্ত হলেও মেয়েমানুষ।

হরেনই খ্যাঁক করে উঠল, তার কি করতে হবে?

না, দেখ, আজকাল দেশের এই অবস্থায় নারী জাতির—সে খুব গম্ভীর গলায় আরম্ভ করেছিল। হরেন ভেংচে উঠল, আর থাক্, তোমার আর পেগ্‌তিছিল বক্তিমে দিতে হবে না। শালা, আজ একটা মেয়ে যদি আঁচল উড়িয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, কাগজ নিয়ে ওঠে গাড়িতে, তবে আর তোমাকে পয়সা দিয়ে চাল কিনে খেতে হবে না, বুঝেছ?

কাগজ বিক্রেতা বিমূঢ় গলায় বলল, অ্যাঁ?

ভিকস্ বলল, অ্যাঁ নয়। হ্যাঁ। ব্যাটা, শোঁক শোঁক, ভিকস্ শোঁক, মাথাটা সাফ কর।

কিন্তু কাগজ বিক্রেতার গোঁফজোড়া বেয়াড়ারকম বেঁকে রইল, না রে, কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়।

মবুটন বলে উঠল, এ যে পুতুলের সাক্ষাৎ বাপ এল দেখছি।

তাই না বটে! সবাই তিক্ত গলায় হেসে উঠল।

বিদ্রূপ ও চিৎকারে যেন পুষ্পকে ওরা তাড়া করে নিয়ে এল শিয়ালদায়। তারপর সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। পুষ্প মুখ খোলবার আগেই সেই বহু পশরার বিজ্ঞাপনের কলরোলে ডুবে গেল তার গলা। তেমনি করেই আবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল তার স্টেশনে।

দেবে না, তাকে ওরা কোন অধিকার দেবে না। আইনের অধিকার দেওয়ার মালিক যারা, তাদের মুখোমুখি কোনদিন দাঁড়াতে হবে কিনা কে জানে। কিন্তু আসল অধিকারীরাই বিরূপ।

শুধু এই চলল। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আর তাড়িয়ে নিয়ে আসা। প্রতিবাদী যাত্রী হয়তো কেউ কেউ ছিল। তারা সংখ্যায় নগণ্য। অধিকাংশ শুধু মজাই দেখে যেতে লাগল।

কেবল, পুষ্প প্রতিদিন থমকে দাঁড়ায় বাড়ি ফেরার পথে, অন্ধ গলি পথটায়। যেন ছায়ালোকের কোন অভিশপ্ত আত্মা। কখনো চুলের গোছা দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে। কখনো শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বুকের কাপড়।

ওরা চেয়েও দেখল না, মেয়েটা দিন দিন শুকোচ্ছে। চুলগুলো জট পাকাচ্ছে। সেই একই অধৌত জামাকাপড় ধূলিমলিন হয়ে উঠছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মারামারি করে, কিন্তু বন্ধুত্বে কখনো ফাটল ধরে না। কেবল পুষ্পকে ওরা তাড়া করে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে নানান কথা।

কোনদিন বলে, পুলিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব জমজমাটি। নইলে আর বেমালুম পুতুলের মা হয়ে রেলে ঘুরছে?

অথচ সেপাইগুলি চোখ ঘোঁচ করে গোঁফ পাকায় তার দিকে চেয়ে।

কোনদিন বলে, রেলের বাবুদের কাছেও যাওয়া আসা আছে, সেইজন্যেই অত সাহস।

সত্যি, এ যে কোন্ সাহস ঠেলে দিয়েছে তাকে এই পথে, পুষ্প নিজেও ভালো ভাবে টের পায় না।

কখনো লোকের ভিড়ে, রেলের পা-দানিতে চোখাচোখি হয় হরেনের সঙ্গে। হয়তো হরেন তখন বিপজ্জনকভাবে ক্রাচ্ সহ চলন্ত ট্রেনে কামরা বদলাচ্ছে। কখনো ভিকৃসের ক্ষুধাকাতর চোখের সঙ্গে, অদম্য কাশিক্ষুব্ধ মবুটনের সঙ্গে, রুগ্ন তানসেনের গুলির সঙ্গে।

যেন কিছু বলতে চায় পুষ্প। কিন্তু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুক

ফাটে তো মুখ ফোটে না তার। মুখ ফোটে না, অপমানে ধিক্কারে ঘৃণায় জ্বলে যায় বুকের মধ্যে।

একদিন শিয়ালদায় কে তার কানের কাছে বলে উঠল, পুতুলের মার ক-বিয়ে? ফিরে দেখল পুষ্প, অদূরে দার্জিলিংয়ের লেবুর বাঁকা চোখ-জোড়া। আর তার সামনে একটি নতুন বর আর কনে বৌ। কনেবৌ, কানে দুল, নাকে নাকছাবি, গলার, হাতে চুড়ি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পুষ্পর দিকে। পুষ্পর চুলের দিকে।

হকারনি নয়, স্বপ্ন নেমে এল হঠাৎ আঠারো বছরের এক বাঙালী মেয়ের চোখে। যেন হঠাৎ চুলকে উঠল তার নাকের ও কানের খোলা ছিদ্রগুলি। ছোটকালে বিঁধিয়েছিল বাপমা শখ্ করে। একদিন সোনা পরবে বলে। বাপ-মা না পারুক বরের সোনা পরবে বলে। ওই বেশে একদিন সাজবে বলে। আজন্ম শুভ্র সিঁথি একদিন লাল হবে বলে।

সত্যি, কত বিয়ে করেছে পুষ্প মনে মনে? শৈশবের সেই বিয়ের যে সংখ্যা নেই। দার্জিলিংয়ের লেবুকে বলবে কি করে সে কথা?

কনেবৌটি দিব্যি জিজ্ঞেস করল, অসুখ করেছে ভাই?

না তো?

তবে অমন ধুঁকছ যে?

পুষ্প হেসে বলল, এমনি।

তাই তো, পুষ্প অবাক হয়। বৈশাখ এসে পড়েছে। চৈত্র চলে গেছে তাই এত বিয়ের হিড়িক। বর-কনেরা বেরিয়েছে পথে। আর এতদিন মাত্র সাতটি পুতুল বিক্রি করতে পেরেছে পুষ্প। অনেক বাধা মাড়িয়ে পেরেছে।

কিন্তু তাতে আশা বাড়েনি, বিপদ বেড়েছে। ঘরে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস

বাইরে। কোথাও সে কিছু পেল না, দিতেও পারল না। এবার তাকে যেতে হবে পথে ফেরি করতে: পুতুল, হাতে-গড়া পুতুল নেবেন ?
আবার কানে এল, পুতুলের মা অনেক বিয়ে বিয়ে খেলেছে। এবার পুতুলের বিয়ে দেবে।
আহা! আজকে ওরা কী কথাগুলিই বলছে! সত্যি, কত বিয়ে বিয়ে খেলেছে। কিন্তু সেই পুতুল নিয়ে খেলা তো তার আজও শেষ হল না। একদিন শেষদিন মনে করে এল সে। আজকে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে চলে যাবে কলকাতার পথের ফেরিতে।
কিন্তু যেতে পারল না। আজ আইনের অধিকারীরা স্টেশনের চারপাশে জাল ছড়িয়ে বসেছিল। বেটন ও বন্দুকধারী পুলিসের বেশে ব্যূহ রচিত হয়েছিল বেআইনী হকারবৃত্তি নিবারণের স্পেশাল কোর্টের। যারা ছিল কাছেপিঠে, তারা ধরা পড়েছে অনেকেই। দুপুরের ঝোঁকে যারা বাইরে মফস্বলে চলে যায়, ফিরে আসে বিকালে, এবার আক্রান্ত হল তারা।
হঠাৎ পুলিসের আক্রমণে, চিৎকারে, গণ্ডগোলে, যাত্রীদের অকারণ ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে একটা শ্বাসরুদ্ধ দৃশ্যের অবতারণা হল।
ধ্বক্ করে উঠল পুষ্পর বুকের মধ্যে। পুলিস দেখে নয়। সে দেখল হরেনের একটা ক্রাচ ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে, আর তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই। ক্রাচটা তুলে নেওয়ার জন্যে অগ্রসর হতেই তাকে বিশালকায় এক মহিলা এসে শক্ত হাতে ধরল। আর পুলিসের চড় খেতে খেতে একটা পানবিড়িওয়ালা ছোট্ট ছেলে কুড়িয়ে নিল হরেনের ক্রাচ্‌টা।
কিছু বলবার অবকাশ মিলল না। গলায় সোনার চন্দ্রহার, আর হাতে

কঙ্কন ও ঘড়িপরা মহিলাটি পুষ্পকে এনে হাজির করল টেবিলের সামনে।
একটা খেঁকুড়ে গম্ভীর গলা শোনা গেল, লাইসেন্স আছে ?
না।
পঞ্চাশ টাকা ফাইন বার কর।
পঞ্চাশ টাকা ?
পুষ্পর মনে হল, তাকে বুঝি ঠাট্টা করেছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
অনাদায়ে সাত দিন হাজতবাস।
মহিলাটি তার কাঁধ থেকে পুতুলের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। নিয়ে ঠেলে দিলে পুলিসের ঘেরাওয়ের মধ্যে। সেখানে আর কেউ নেই, শুধু সে। পুষ্পবালা ঢাকার বজ্রহাটের অমুক মাস্টারের মেয়ে।
সেখান থেকে পুষ্প দেখল, পারিজ স্নুইট হরেন, ভিকস্‌, বায়রন, মরুটন, চানাচুর, প্রগতিশীল কাগজ বিক্রেতা, দার্জিলিংয়ের লেবু সকলেই রয়েছে, আর একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে। ঘর্মাক্ত ধুলোমাখা, উস্কো-খুস্কো। ওদেরই মতো জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে ওদের মালগুলি।
কে বলে উঠল, আরে শত হলেও হকারনি। কর্তারা রাত্রে ঠিক ছেড়ে দেবে দেখিস।
হয়তো দেবে। যদি না দেয় ? যদি না দেয়, তবে মা ভাববে, সন্দেহ এতদিনে কাটল। সর্বনাশী শেষে সর্বনাশ করে পালিয়েছে। কিন্তু পালাতে পারেনি তো এতদিন। তারপর চালান দিয়ে দিল সবাইকে হাজতে !

সাতদিন পর।
বেলা দশটায় কোর্ট খুলল। বেলা এগারটায় ছাড়া পেল হকারেরা।

সকলেই গিয়ে জড়ো হল, ভিড়ের বাইরে, পুবের রেলহাসপাতালের কাছে।

এঃ শালা, চানাচুরগুলো সব সাবাড় করেছে ধর্মপুত্তুর সেপাইরা।

আমার একটা লজেন্সও নেই মাইরি।

দার্জিলিংয়ের লেবু সব ফাঁক।

মাইরি আমার কাগজগুলোও কমে গেছে। ওরা কি প্রগতিশীল কাগজও পড়ে!

পড়ে, ধার দেখবার জন্যে।

হ্যাঁরে, সেই মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছে না?

তারপর হাসি আর গালাগালির একটা ঝড় বইতে থাকে। হরেন চেঁচিয়ে উঠল, আমার অনেকগুলি মাল আছে।

মাইরি?

মাইরি। আয়, সব হাজত-খাটাকে এক করে দিই, তারপর নতুন করে আবার আরম্ভ করা যাবে।

বলতেই সবাই ঘিরে এল তাকে, সে একটা করে লজেন্স দিতে লাগল সবাইকে।

হঠাৎ চাপা গলায় ভিকস্ ডাকল, এই হরেন!

হরেন বলল, কি?

ওই ছ্যাখ!

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, পুতুলের মা। কোর্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। চুলগুলি জড়ানো কিন্তু জট পাকিয়ে আরো বড় হয়ে উঠেছে। স্যাণ্ডেল নেই, খালি পা। কাপড়টা কুঁকড়ে পায়ের থেকে উঠে গেছে অনেকখানি। চোখের কোলগুলি বসে গেছে। গাল দুটো গেছে চড়িয়ে। ঝুঁকে পড়েছে নীচের দিকে। কাচের চুড়িগুলি

হলহল করছে হাতে। ব্যাগটা ঝুলছে কাঁধে।
ওরা সকলে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু, একসঙ্গেই সকলের গলায় হাসিটা কি রকম আটকে গেল। একজন বলল, হাজতে ছিলরে। হ্যাঁ, কিরকম দেখাচ্ছে, না?
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হরেন। খট্‌খট্‌ করে খানিকটা গিয়ে, খ্যাঁকারি দিয়ে ডেকে উঠল, পুতুলের মা!
পুষ্প দাঁড়াল থমকে। ঠিক এমনি সুরের ডাক তো কখনো শোনেনি সে ওদের কাছ থেকে। তবুও নতুন অপমানের জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। আজ শুধু অপমান নয়, শোধও নেবে।
পেছনে সকলেই ভ্রূ কুঁচকে, চোখ তুলে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। আর ঠক্‌ঠক্‌ করে হরেন এসে দাঁড়াল পুষ্পর সামনে। পুষ্পর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল হরেন। কৌটো থেকে একটা লজেন্স্‌ বের করে হরেন বলল, মানে, যারা হাজত খেটেছে, তাদের সকলেরই একটা করে পাওনা হয়েছে। তা আপ......আপ......মানে তোমার একটা আছে। নিতে হবে কিন্তু ভাই।
কি শুনছে, এ কী শুনছে পুষ্প! হরেনেরা, হকাররা তাকে তাদের সঙ্গিনী করে নিচ্ছে? তাদের পুতুলের মাকে।
ততক্ষণে সকলেই ভিড় করে এসেছে। আর পুষ্পর শিশুর মতো মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরনা, সেই সঙ্গে আচমকা চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। সে লজেন্সটা নিল।
হরেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, সত্যি, মানে কেঁদে কিছু হয় না, তুমি কেঁদো না। বলতে বলতে তারও গলাটা আটকে এল। আর সবাই নিঃশব্দে ঢোঁক গিলছে।
তারপরে বলল, চানাচুরের শেষ প্যাকেটটা তুমি খাও।

দেখা গেল সকলেই, তাদের অবশিষ্ট মালটুকু পুষ্পর হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত।

এই নাও, একটা কাগজও দিলুম, পড়ো।

কাগজটা কি তা বললি না ?

হেসে উঠল সকলে। চোখের জলে ও হাসির আলোছায়ায় অন্ধ হয়ে এল পুষ্পর চোখ। সে দেখল শুধু, তাকে ঘিরে ওদের হাজত-খাটা উস্কো-খুস্কো চেহারার ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে সে একাত্ম!

অকাল বসন্ত

অবশেষে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। যাই যাই করে তবু বর্ষা এখনো যেতে পারেনি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লাল ছোপ ধরে গেছে সেই মেঘে। উড়ে চলেছে দিক হতে দিগন্তরে এই মফস্বল শহরের কারখানা ইমারত ও অসংখ্য বস্তির ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো অর্থাৎ ভালোরাম আর একটা রুদ্ধশ্বাস কানা গলির মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার অভয়পদ। প্রৌঢ় ভোলা এখানকার স্থানীয় লোক। কাজ করে একটা সামরিক যানবাহনের কারখানায়। অভয় তার কারখানার কর্মী, ভারি ট্রাকের ড্রাইভার। কিন্তু বিদেশী। ভেলো তাকে একটা ঘরের সন্ধান দিয়েছে তাই সে চলেছে তার নতুন বাসায়। সামগ্রী বলতে হাতে তার একটা টিনের সুটকেশ ও ছোট বিছানার বাণ্ডিল। গলিটাতে দিনের বেলাও অন্ধকার। দু-পাশে ঘন টালি ও খোলার চালা গলির মাথায় আর একটা দীর্ঘ চালার সৃষ্টি করেছে। আকাশ দেখা যায় না, এক ফালি রূপোলী পাতের ঝিলিকের মতো মাঝে মাঝে দেখা দেয়। গলি পথটাকে পথ বলার চেয়ে নর্দমা বলাই ভালো। দু-পাশের বস্তির যত ক্লেদ এসে জমেছে সেখানে। নর্দমা থাকলে ময়লা বেরুবার একটা পথ থাকত। কিন্তু তা নেই। সারা গলিটার মধ্যে একটা মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে

মেয়ে পুরুষ ও শিশুর ভিড় ও পাঁতি হাঁসের প্যাকপ্যাকানির মতো পাম্পের শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গেই ঝগড়ার চিৎকার ও হট্টগোল। গলিটার ঢোকবার মুখে একটা বাতি আছে, ইলেকট্রিক বাতি। সেটা এখনো জ্বলছে। সব সময়েই জ্বলে। গলিটা যে স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটির আওতারে, ওই বাতিটাই তার প্রমাণ।

ভেলোর সঙ্গে অভয়কে দেখে গলির লোকগুলি সবাই একবার করে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোন আপদ এসে জুটেছে তাদের পাড়ায়।

অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানী খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যান্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মতো দীর্ঘবেড় টুপি। পায়ে ভারি বুট। চেহারাটা তার সাধারণ বাঙালীর তুলনায় অনেক লম্বা। মাথাটা চালার গায়ে ঠেকে যাওয়ার ভয়ে ঘাড় গুঁজে চলেছে সে। যেন কোন দলছাড়া সৈনিক চলেছে ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে। কিন্তু মুখে তার এখনো কোমলতার আভাস। চোখে এখনো স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ তাকে খানিকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে, নয়তো দুর্বোধ্য।

সে আর না ডেকে পারল না, 'ভেলো খুড়ো।'

ভেলোকে ওই নামেই সবাই ডাকে কারখানায়। বলল, 'ভাবছ কেন। তুমি বামুনের ছেলে, ভালোরাম কি তোমাকে মিছে কথা বলবে। পাকা বাড়ি, যাকে বলে ইঁটের গাঁথনি, খুঁটে খুঁটে দেখে নিও, বুঝেছ ?'

বুঝেছে, কিন্তু এই বস্তির ভিড়ে পাকা বাড়ির কোন ইশারাও যে চোখে পড়ে না। ভেলো গোঁফের ফাঁকে হেসে আবার বলল, 'কিন্তু যা বলছিলুম, একটু সাবধানে থেকো, বুঝলে দাদা। মানে, আইবুড়ো

ছেলে তুমি। আলোর আর কি বল, মরে তো শালার বাদলা পোকাগুলান।'

'তার মানে, আমিও মরব?' অভয়ের গলায় যেন বিরক্তির ঝাঁজ।

ভেলো বলল, 'ওই, চটলে তো? ওটা একটা কথার কথা। সেখেনে কি আর পেত্‌নী আছে যে ঘাড় মটকাবে। মানুষ খুব ভালো, জানলে। তবে মানুষের প্রাণ……'

'মানুষের প্রাণ!' ভেলোর কথার রেশ টেনে বলল অভয়, 'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ওসব বালাই নেই।' বলতে বলতেই দাঁড়াল দুজনে। সামনেই একটা চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্য রকম একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। বড় বড় শালপাতার মতো অজস্র কালচে কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবাটি লতার বেষ্টনিতে ঝুপসি ঝাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। তলা ঘেঁষে স্তূপাকার হয়ে আছে আধলা ইঁটের রাশি। তার আড়ালে একটা ভাঙা বাড়ির ইশারা জেগে রয়েছে। তারও পেছনে যেন ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি, মাঠ ও রেল লাইনের উঁচু জমি।

ভেলো বলল, 'ওই যে তোমার বাড়ি।'

বাড়ি? বাড়ি কোথায়? বস্তির গায়েই এই হঠাৎ অবাধ উন্মুক্ত জায়গাটা নির্বাক বিষণ্ণতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। লোকজন দেখা যায় না একটাও। এ নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে যেন একটা নিরাকার অস্থিরতা অদৃশ্যে ছুটফট করে মরছে। এর মধ্যে বাড়ি কোথায়।

ভেলো বলল, 'এসো।'

বলে সে মুচকুন্দ গাছটার তলা দিয়ে একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এগুল। পুকুরটায় কচুরিপানার ঘন বিস্তার। পুষ্ট লকলকে ডগাগুলি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কালকেউটের ফলার মতো। তার মধ্যেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ভাঙা ইঁট বসিয়ে ঘাট করা হয়েছে। ঘাটের কোলে কালো জল, গভীর ও নিস্তরঙ্গ।

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা ভাঙা বাড়ি। পোড়ো বাড়ির মতো। বাড়িটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটে বেড়ার আড়াল রয়েছে। দেয়ালের ইঁট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর চাপটির দাগ। বোঝা যায়, একসময়ে দোতলা ছিল, এখন ভেঙে গিয়েছে। বট অশ্বত্থের চারা আর বনকমলির লতা নীচে থেকে উপরে অবাধে জড়িয়ে ধরেছে সর্বাঙ্গ। সামনের ঘরটার জানলায় গরাদ নেই। পোকা খাওয়া পাল্লা দুটো আছে। ফাটল ধরা ভাঙা বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে ছাগলনাদি। বারান্দার নীচেই কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে কালকাসুন্দের বন। বন সেজেছে। অন্ধকার রাত্রের আকাশে খই ফোটা নক্ষত্রের মতো ফুটেছে কালকাসুন্দের ফুল, হল্‌দে আর লাল কৃষ্ণকলি।

ভেলো বলল, 'কি গো, পছন্দ হয় কি না হয়? ফুল বাগান, পুকুর……'

অভয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পাকা বাড়ি। খুঁটে আর দেখব কি, এ তো খাসা ইঁটের বাড়ি। তবে পোষাবে না ভেলো খুড়ো, চল কেটে পড়ি। ও আমার ঘিঞ্জি বস্তিই ভালো, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে পারব না।'

ভেলো হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'সাপ কোথায়, এখেনে মানুষ

বাস করে। কলকারখানার বাজারে একটু হাঁফ ছাড়তে পারবে। আর·· ·· '

কথা শেষ হওয়ার আগেই ছিটে বেড়ার আড়াল থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এল। একটি মেয়ের মুখ। রংটা মাজা মাজা, হঠাৎ ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, কিন্তু সিঁদুর নেই কপালে। আঁট করে বাঁধা চুল। মুখে হাসি। কিন্তু সামনে মানুষ দেখে হাসিটা মিলিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় বেঁকে উঠল ভ্রূলতা। অভয়পদের টুপি পরা বিদঘুটে চেহারার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ ভেলো খুড়ো ?'

বোঝা গেল, ভেলো এ সারা অঞ্চলের সকলেরই খুড়ো। বলল, 'কে বিনি ভাইঝি! বলছি, তোর মাকে একবারটি ডেকে দে, সেই লোকটি এসেছে ঘরের জন্যে।'

বিনি একবার আড়চোখে অভয়কে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

অভয় বলে উঠল, 'খুড়ো এ যে একেবারে বিয়ের যুগ্যি।'

ভেলো বলল, 'বে-র কেন, হলে অ্যাদ্দিনে ক-কণ্ডা হত, তাই বল। তা হলে বোঝ, এর উপরে একজন, নীচে আর একজন। তা বে কে দেবে বল। বাপ থাকতেই খেতে জোটেনি, এখন তো বেধবা মা। আর জাতেও যদি শালা বামুন কায়েত হত একটা কথা ছিল, জাত যে তোমার ভেলো খুড়োর, মানে সৎচাষা। আর মা ষষ্টি দিলে দিলে, তিনটেই মেয়ে দিলে। একে বলে কপাল।'

অভয়পদের নিজেরই বুকে যেন উৎকণ্ঠার কাঁটা ফুটল। বোধ হয় তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে, নিজের অবিবাহিতা বোনটির কথা। কিন্তু সে হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু খুড়ো, এখেনে তো আমি থাকতে পারব না।'

ভেলো অবাক হয়ে বলল, 'ওই নাও, তোমার তাতে কি? দেখে শুনে একটা বামুনের ছেলে নিয়ে এলুম বলে, যাকে তাকে তো আর এনে তুলতে পারিনে। আর মেয়েমানুষগুলো একলা থাকে, একটা সাহসও তো পাবে। তারপরে তুমি তোমার ওরা ওদের।'

অভয়ের আবার আপত্তি ওঠার আগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির মালিক, বিধবা বুড়ী। দু-হাতে গোবর মাখা। গায়ে কোনরকম কাপড়টা জড়িয়ে দেওয়া। এল হাঁ করে দাঁতশূন্য মাড়ি বের করে। মুখে অজস্র রেখা পড়েছে যেন জট পাকানো সুতোর দলার মতো। গলার চামড়া গলকম্বলের মতো ঝুলে পড়েছে। কাঁপছে থর্ থর্ করে। বেঁকে পড়েছে খানিক শরীরটা।

চোখে বোধ হয় ভালো ঠাওর পায় না। কয়েক মুহূর্তে অভয়কে দেখে বলল, 'ভেলো, লোকটা বাঙালী তো।'

ভেলো হেসে ফেলল, 'তবে কি পাঞ্জাবী। তোমাকে তো বলেছিলুম সব।'

বুড়ী আর দ্বিরুক্তি না করে অমনি আবার ফিরল, 'না তা বলছিনে। চেহারাটা যেন কেমন ঠেকল। চোখের মাথা তো খেয়েছি। তা এসো, থাক। ঘর আমার বেশ বড়সড়। একটু পুরনো, তা……' হঠাৎ চোপসানো ঠোঁট কেঁপে উঠে গলাটা বন্ধ হয়ে এল বুড়ীর। চোখের কোলে জল এসে পড়ল। বলল, ফিস্‌ফিস্ করে, 'আমি যে জম্মো পাপিষ্ঠা। আমার গলায় বুকে শুধু কাঁটা। সে মানুষটা যদ্দিন ছিল ভাড়া দিইনি, এখন কেউ নিতেও চায় না। তা থাকো।'

চোখ মুছে ডাকল, 'অ নিমি ঘরটা খুলে দে।'

অভয় তাকাল ভেলোর দিকে। ভেলো ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়ো। দুনিয়ার সব জায়গাই সমান, থাকা নিয়ে কথা।'

বলে বুড়ীর পেছন পেছন অভয়কে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে। বাড়ি মানে, বেড়াটার আড়ালে একটা গলি। গলির দু-পাশে দুটি ঘর। ভেতরে দেখা যায় একটা উঠোন। উঠোনের উত্তরে একটা পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ। ওপারে সেই মুচকুন্দ গাছ ও ইটের স্তূপ। নজরে পড়ে বস্তির খোলার চালা আর মোড়ের সেই লাইট পোস্টটা। বাতিটা জ্বলছে তেমনি।

অভয়ের ভারি বুটের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠল গলিটার মধ্যে।

নিমি এসে বাঁ দিকের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। নিমি বিনিরও বড়। সে বোধকরি বিনির চেয়েও ফর্সা। কেননা, অন্ধকার গলিটাতে তার মুখটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তারও চুল আঁট করে বাঁধা। দোহারা গড়ন। চোখে তার শান্ত বিষন্নতা। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।

দরজাটা খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। তার পেছনেই দাঁড়িয়েছে টুনি, সকলের ছোট। বিনির মতোই একহারা ছিপছিপে গড়ন তার। চোখের কালো তারায় খর চাউনি, বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। অভয়ের চেহারা দেখেই বোধ হয় তার ঠোঁটের হাসিটুকু ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার চুল খোলা। হয়তো বেঁধে ওঠার অবসর হয়নি।

ভেলোর পেছনে ঘরে ঢুকে সুটকেশ ও বিছানা নামিয়ে অভয় একবার ভালো করে ঘরটার চারদিক দেখে নিল। মেঝেটার অবস্থা মুখে বসন্তের দাগের মতো। সিমেণ্ট উঠে গিয়েছে এখানে সেখানে। দেয়ালের অবস্থাও তাই। পলস্তারার 'প' নেই, সর্বত্রই নোনা ইট বেরিয়ে পড়েছে। তবে ঘরটার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা বোঝা যায়। ঘরটার কোলেই সেই বারান্দা, কৃষ্ণকলি ও কালকাসুন্দের ঝাড়, তারপরে পুকুর।

ভেলো বলল, 'নাও, ঘর দোর সাজিয়ে বস, এবার আমি চললুম। ভাড়ার কথা বলাই আছে।'
বলে ভেলো লোম ওঠা ভ্রূ-সংকেতে ইশারা করল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চললুম গো বৌঠান, এবার তোমরা বুঝে পড়ে নিও।'
বলে সে চলে গেল। একে একে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, নিমি, বিনি, টুনি। বুড়ী বলল, 'ওই পুকুরে নাইবে; খাবে তো তুমি হোটেলে। না যদি খাও, বাড়িতে আলগা উমুন নিয়ে এস, রেঁধে বেড়ে খেও। আর……'
কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি যেন তীরের মতো এসে বিঁধল এ ঘরের দুটো মানুষের বুকে। একজনের জিভ্ আড়ষ্ট, চোখে শঙ্কা, কুঞ্চিত লোল চামড়া আবৃত জড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর একজনের ঠিক ভয় নয়, তবু যেন ভয়। আর একটা নাম-না-জানা তীব্র অনুভূতিতে নিশ্বাস আটকে রইল বুকের মধ্যে।
তারপর হাসিটা নিশ্বাসের দমকে দমকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল, নিঃশব্দ জলের বুকে বুদ্‌বুদের শব্দের মতো। ঈষৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কৃষ্ণকলির ঝাড়।
লাল মেঘের বুকে পড়েছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। এ নৈঃশব্দ্যের ফাঁকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্ধ গলিটার হট্টগোল।
বুড়ী হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বুকের দু-পাশ ও গলাটা দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এই বুকে আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে, রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি, যেদিন আমি থাকব না।'

বলেই সে যেন আগুনের হল্‌কার জ্বালায় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। ঝোল-ঝাব্বা পরা অভয় একটা অতিকায় ভূতের মতো নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এ কোন্‌ হতভাগা জায়গায় এনে তুলল আমাকে ভেলো খুড়ো। যে নিশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরতে লাগল।

বোধ করি, সেই নিশ্বাসটা ফেলবার জন্যেই অভয় সেই ভোর বেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। আসবার সময় রোজই শুনতে পায় পাশের ঘরটায় খস্‌ খস্‌ কাগজের শব্দ। যে মুহূর্তে গলিটাতে তার বুটের শব্দ হয়, তখন থেকে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে বেলোয়ারী চুড়ির রিনিঠিনি। একটু বা ফিস্‌ফিস্‌, কিংবা চাপা হাসির সঙ্গে কোন গলার একটা মৃদু শব্দ।

অভয় শুনেছে ভেলো খুড়োর মুখে, ওরা তিন বোন কাগজের ঠোঙা আর পিসবোর্ডের বাকস তৈরি করে। ওটাই ওদের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু অভয়ের শরীরটা তখন অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। সারাদিনে ভারি ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি আর বিরাট হাতীর মতো বডিটার ঝাঁকুনি গায়ের মাংসপেশীতে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। নাকের মধ্যে ভারি শ্লেষ্মার মতো ধুলো জাম হয়ে থাকে।

কোন রকমে লম্ফটা জ্বালিয়ে বিছানা পেতে বিড়ি ধরিয়ে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়া। খাওয়া হয়ে যায় সন্ধ্যার একটু পরেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় হয়তো নিমি ডাকছে বিনিকে কিংবা বিনি টুনিকে। ওদের খাওয়ার সময় হল। খাওয়ার পর গলিটার বুকে ওদের পায়ের

টিপটিপ শব্দ শোনা যায়, ভীত চকিত মানুষের বুকের দুরু দুরু যেন। আবার সেই চুড়ির রিনিঠিনি। রাত্রির নৈঃশব্দ্যে আবার সেই চাপা চাপা গলার আভাস। পুকুর ঘাটে শোনা যায় বাসন ধোয়ার আওয়াজ।

তিন বোনের গলা আলাদা করতে পারে না অভয়। শুধু শোনে, কেউ বলে, 'উঃ পায়ে কি ব্যথা হয়েছে রে।' কেউ বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে।' কেউ বা, 'সেই মুখপোড়া সাউটা সাত সকালেই মাল নিতে আসবে, বাকসের গায়ে তো এখনো লেবেল আঁটা হল না।'

অন্ধকারে যতই ঝিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কান দুটো যেন হাঁ করে থাকে। তারপর হঠাৎ কি কারণে তীব্র মিষ্টি গলার খিলখিল হাসিতে শিউরে ওঠে রাত্রি। যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে। কিন্তু হাসিটা শেষ হয়ে আবার সেই অস্থিরতাই দলা পাকিয়ে ওঠে।

অভয় অশরীরী সাক্ষীর মতো উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় মুচকুন্দ গাছে ঝুপসি আর মোড়ের সেই বাতিটা। তার এক চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিটা যেন বিদ্রূপ করে বলতে থাকে অভয়কে, আমি জেগে আছি বহুদিন, এবার তুইও জাগছিস।

পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে, তার গায়ে। সে ছেলেমানুষের মতো মটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি ফুটছে তার গায়ের মধ্যে।

তারপর আবার নিঃশব্দ ও অন্ধকার। শুধু দূরের কারখানার বয়লারের ধিকিয়ে চলার একটানা ঘুস ঘুস শব্দ।

সেদিন রাত্রে ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকলির বনে থমকে দাঁড়াল অভয়। কে যেন কাঁদছে। এখনো বস্তিতে হট্টগোল, টিউবওয়েলের প্যাকপ্যাকানি। তার মধ্যে এখানকার নিরালায় কান্নার শব্দ।

অভয় কান পাতল। ভুল হয়েছে। কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলার মিলিত সরু গলার গান। গাইছে দুই বোন।

বনের আগুন সবাই দেখে,

মনের আগুন কেউ না দেখে,

সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।

সে গানের টানা সুরের লহরীতে রাত্রি দুলছে না, আড়ষ্ট ব্যথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। শরতের আকাশে আধখানা চাঁদ, অসংখ্য অপলক চোখের মতো তারা। নীচেও তারার মতোই রাত্রির নিরালায় ঘোমটা খোলা কৃষ্ণকলি।

কিন্তু হাসি নেই, সুপ্তির আরাম নেই। চাপা আগুনের পোড়ানিতে যেন এ বিশ্বসংসার দিশেহারা, তবুও নির্বাক নিরেট।

ধিকিধিকি আগুন জ্বলে যেন অভয়ের বুকেও। ভাবে, পেছুবে। কিন্তু পেছিয়েও সামনেই এগোয়। গানটা থেমে গেছে। তবুও আবার থামতে হয়। শোনা যায়, একজন বলছে, 'না এখনো আসেনি।'

আর একজন, 'কে সেই মিলিটারি তো?'

'মিলিটারি নয়রে, ভোলা খুড়ো বলছিল, মোটরের মিস্তিরি।'

অভয় নিজের অজান্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শোনে, 'মাইরি, লোকটা যেন কি। আমাদের বোধ হয় ভয় পায়।'

আর একজনের তীব্র বিদ্রূপাত্মক গলা শোনা যায়, 'ভয় নয়, ঘেন্না করে। ভাবে, ধুমসি পেত্‌নীগুলো কোনদিন দেবে ঘাড় মটকে।'

তারপর একটা হাসির উচ্ছ্বাস উঠতে গিয়েও মাঝ পথেই ট্রাকের অ্যাক্সিলেটর চাপার মতো সেটা থেমে যায়। শব্দ ওঠে কাগজের খস্‌খস্‌।

অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞেস করেও জবাব না পাওয়ায় বোকার মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খট খট শব্দ তুলে ঝনাৎ করে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু পরদিন শরৎ আকাশের রং-বাহারী পড়ন্ত-বেলায় অবিশ্বাস্য রকমে অভয়ের বুটের শব্দ শোনা যায় গলিতে। শব্দটা অভয়ের নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়, কি একটা মহাপাপ করে ফেলেছে সে।

ওদিকে তিন বোনের কি একটা গুলতানি চলছিল। ওরাও একেবারে চুপ হয়ে গেল।

ওদের বুড়ী মাও আশেপাশেই আছে কোথাও। বুড়ী সারাদিন ওই মুচকুন্দ গাছের মোটা গোড়া থেকে শুরু করে এখানে সেখানে ঘুঁটে দিয়ে ও গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে, না বিষ না মধু সেই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি তার নিয়ত সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা ঘুরছে।

অভয় এই মুহূর্তের সংকোচ ও আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তোলার জন্যেই যেন দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে, খাকী ঝাল-ঝোব্বা খোলে। গামছা কাঁধে নিয়ে হুস হুস করে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে এসে বসে। অনেকদিন পরে বিকালের দিকে শরীরটা ক্লেদমুক্ত হয়ে একটু আরাম পায়। কিন্তু মনের মধ্যে থাকে একটা বিষের খচখচানি।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির বনে তিন বোনের মূর্তি ভেসে ওঠে। খালি গায়ের উপর কাপড় জড়ানো। তিনজনই সত্ত বাঁধা মস্ত খোঁপায়

দিয়েছে চন্দনের বিচির মতো লাল মটর দেওয়া সস্তা কাঁটা। সেগুলি যেন কুণ্ডলীপাকানো কালসাপিনীর চোখের মতো জ্বল জ্বল করে। আর আশ্চর্য। এতখানি বয়সেও ঘোচেনি কারো লালিত্য। যৌবনের জোয়ারে ধরেনি ভাঁটার টান। জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত সুউচ্চ রেখায়।

তবু যেন মনে হয় একটা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে তাদের। নিমি যেন এক ছেলে মরা মা, বিনি মন-গোমরানো বৌ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।

তিন বোন যেন তিন সই। মিটি মিটি হাসে, আড়ে আড়ে চায়। তবু চাইতে পারে না। তিনজনে গায়ে গায়ে গিয়ে নামে পুকুরের জলে। ঢেউয়ে দোলে কচুরিপানা ফণা তোলা কালনাগিনীর মতো।

অভয় চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারে না। জানলা থেকে সরে আসব আসব করেও সময় বয়ে যায়। না দেখতে চেয়েও দেখে ছপছপ শব্দে গা ধুয়ে ফিরে চলেছে তিনজনা। না হাসি না হাসি করেও ফিক করে হেসে উঠে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে যায় সমস্ত জায়গাটা।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে চমকে ওঠে অভয়। পেছনে দেখে বুড়ীমা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের আকাশের দিকে। থরথর করে কাঁপছে অতিকায় গিরগিটির মতো গলার চামড়া। অভয় ফিরে তাকাতে ফিসফিস করে বলে, 'বুকের মধ্যে ধুকধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা রাখি, যাই কোথা। খালি তরাসে তরাসে মরি।' বলেই বুড়ী বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। অভয়ের মনে হয় সে পাথর হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বস্তির গণ্ডগোল হাসি ও হল্লা। ঢোলক অথবা খঞ্জনির বাজনা।

এমনি চলে কয়েকদিন। রোজই অভয় ফিরে আসে বিকালের ছুটির পর। আসব না করেও আসে।

কয়েকদিন পর, বিকেলে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকে অভয় থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে যেন এক অবিশ্বাস্য বস্তু দেখে চমকে উঠল। দেখল এলুমিনিয়ামের গেলাসে খয়েরী রং-এর ধূমায়িত চা। চা? চা-ই তো, হ্যাঁ। মনে হল গেলাসটা সাগ্রহ চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখে।

অভয় একবার ভাবল, পেছন ফিরে দেখে। কিন্তু দেখে না। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে ধীরে সুস্থে চায়ের গেলাসটি নিয়ে চুমুক দেয়। ঢোঁকে ঢোঁকে উষ্ণতাতে বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। মনটা ভোর হয়ে আসে।

তারপর শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেলাস নিয়ে গলিটা পেরিয়ে একেবারে ভেতরের উঠোনে এসে পড়ে। শূন্য উঠোন। কেউ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল তিন বোন মাথা নীচু করে কাজে ভারি ব্যস্ত।

অভয় বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে করেও কথা আসে না মুখে। কয়েক মুহূর্ত এমনি চুপচাপ।

হঠাৎ টুনিই বলে, 'তুই দিয়ে এসেছিলি বুঝি।'

নিমি বলে, 'আমি কেন, বিনি তো।'

বিনি বলে 'ওমা, কী মিথ্যুক। আমি কেন বামুনের ছেলেকে চা দিতে যাব।'

অভয় দেখে কালো চোখের চোরা চাউনিতে হাসির চকমকানি। হাসিটা তারও মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলে 'না হয় গেলাসটা হেঁটে হেঁটেই গেল, তাতে বামুনের জাত যাবে না। বামুন আর কোথায়, একেবারে জাত ড্রাইভার। সারাদিনের খাটুনির পর বিকেলে এ রকম, মানে একটু চা পেলে···, আচ্ছা আমি না হয় চা চিনিটা··· ।' বলে সে হেসে ফেলে।

ততক্ষণে তারা তিন বোন উচ্চ হাসিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। টুনি বলে, 'বিনি, তু-ই না হয় চা-টা দিস।'

বিনি বলে, 'নিমি, তুই তাহলে দুধটা দিস ?'

নিমিও বলে, 'চিনিটা তাহলে টুনির।'

তারপরে আবার হাসি। এবার অভয়ও না হেসে পারে না। এই ভাঙা বাড়ির বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধ হয় এই প্রথম। যেন এখানকার চাপা পড়া দুঃসহ অস্থিরতা একটা মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই হাসিটা থেমে এল বুকে ফিক ব্যথা লাগার মতো। ফিরে এল সেই রুদ্ধ অস্থিরতা।

নিমি বলে, 'বিনি, মা কোথা ?'

বিনি বলে, 'মাঠের ধারে গোবর কুড়োতে গেছে। পালের গোরু ফিরবে এবার।'

তবুও কেউই চাপতে পারে না একটা ছোট্ট নিশ্বাস। তিনজনের মধ্যে মূর্তি ধরে ওঠে হতাশা।

পথের মাঝে বেগড়ানো গাড়ির বেয়াকুব ড্রাইভারের মতো অবাক ও মুগ্ধ হয়ে ওঠে অভয়।

কিন্তু এমনি করেই আড় ভেঙে যায়। খুলে যায় সেই রুদ্ধ দ্বার। বাধা-

মুক্ত জোয়ার এগোয়। কখনো সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে, কখনো এড়াবার সুযোগ পাওয়াও যায় না।

প্রথমেই তিন বোনের অসীম কৌতূহল, কোথায় বাড়ি, কে কে আছে।

অভয় বলে, 'কে আবার থাকবে। ছোট ছোট ভাই বোন আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমার পোষ্য।'

'আর বিয়ে?'

'বিয়ে কে দেবে আর কে করবে? কথায় বলে, নিজের জোটে না, আবার শঙ্করাকে ডাকে।'

তারপর এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে, 'তোমাদের রোজগার কি রকম?'

নিমি বলে, 'ছাই! খেতে জোটে না।'

বিনি বলে, 'তিনজনের খাটুনিতে রোজ কুল্লে দু-টাকার বেশী নয়।'

টুনি বলে, 'আর মা ঘুঁটের পয়সা জমিয়ে রাখে।'

'কেন?'

'কেন? আমাদের বিয়ে দেবে বলে।' বলে তারা তিনজনেই তীব্র বিদ্রূপ ভরে হেসে ওঠে। হাসিটা অভয়ের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে বলে, যেন খানিকটা আপন মনে 'হবে না কেন, হবে।'

হবে! যেন এমন বিচিত্র কথা তারা কোনদিন শোনেনি, এমনি উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিন বোন তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে।

একটু পরেই টুনিই বলে, 'আমরা তো শঙ্করী। নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে?'

অভয়ের জিভ আড়ষ্ট, বুকে পাথর চাপা। সত্যি, কে ডাকবে, কেমন করে ডাকবে। এ বিশ্ব সংসারে সকলের গলা চেপে রেখেছে যেন

কোন্ অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

ফোটে [illegible] তবু ফোটে। রাত্রির নিরালা অন্ধকারে [illegible] ফোটার সে নিঃশব্দে ফোটে! এখানে গড়ে ওঠে আর এক [illegible] সংসার মেয়ে আর এক ছেলের বিচিত্র সংসার।

যাকে বলে ডেয়ো ঢাকনা, তাই একে একে জড়ো হয় অভয়ের ঘরে। আলগা উনুন আসে, কিনে আনে হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি, থালা, গেলাস।

আর দশটা বাড়িতে যা সম্ভব হয়ে ওঠে না, এখানে তাই হয়। সকাল বেলাই ভাত খেয়ে কাজে যায় অভয়। ভোর রাত্রে উনুন ধরে। মোটর মিস্তিরি কেন এসব পারবে। পালা করে আসে তিন বোন। আসে ভোর রাত্রের আবছায়ায়, বাসি খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে। আবার আসে সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। এসে অভয়কে সরিয়ে নিজেরা বসে রান্না করতে। এক সঙ্গে নয়, পালা করে আসে। ঘরে নিজেদের কাজ আছে, তা ছাড়া সেই সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির খবরদারিও আছে।

তবু আজ আর বাঁধ মানে না। অভয়কে ঘিরে এ তিনজনের আর এক নতুন চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অবারিত হয়ে খুলে যায় চাপা প্রাণের দরজা। অভয়ের রান্না খাওয়া, আর জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিজেরা কেচে দেয়। সবটুকু করেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না। এত আছে যে, দিয়েও প্রাণ ভরে না।

জাত-বেজাতের বাধা ডিঙিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে বসে খাওয়ায় তারা অভয়কে।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গ আঁতিপাতি করে দেখে। চোখে তার মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি।

অভয় বলে, 'কি দেখছ?'

নিমি বলে, 'দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরি, তবু তোমার শরীরটা ভালো করে তুলতে পারছি না।'

অভয় হেসে বলে,'তোমার খালি ওই ভাবনা। আর কত হবে। ড্রাইভার কি দুধগোলা পুরুষ হবে।'

নিমিও হাসে। মন বলে, হ্যাঁ, দুধগোলা পুরুষই হবে। ঢল ঢল কান্তি, গোরাচাঁদ হবে অভয়। আর নিমি সবই ফেলে দেবে সেই গোরাচাঁদের পায়ে।

ভাবতে গিয়ে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে ওঠে।

অভয় সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। বলে, 'কি হয়েছে নিমি?'

নিমি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

এমনি বিনিও আসে। সে যেন একটু রহস্যময়ী। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে খালি অভয়কে বলে, এটা দাও, সেটা দাও! তারপরে, 'আজকে বাজার থেকে এই এনো, সেই এনো।' খেতে গিয়ে, অভয়ের আপত্তি থাকলেও যা প্রাণ চাইবে, তাই দেবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে আর নিঃশব্দে কেবলি কাছে বসেও আড়ে আড়ে চেয়ে টিপে টিপে হাসবে। যেন মনের তলার গুরু কথা তার ঠোঁটের কোণে ঝিকিমিকি করে।

তা দেখে এই হাসিটার মতোই অভয়ের বুকটা ধিকি ধিকি জ্বলে।

জলুনিটা লাগে এসে রক্তস্রোতে। ডাকে ‘বিনি।’
বিনি তাকায়, তার অপলক হাসি চোখে বিচিত্র ইশারা। সুগঠিত ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপা। চাপা গলায় বলে, ‘বল।’
‘কিছু বলছ?’
তেমনি তাকিয়ে বিনি বলে, ‘কি আবার।’ একটু থেমে আবার বলে, ‘তুমি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।’
বলতে পারে না, তাদের মন খাঁ খাঁ করে। সেটুকু কান পেতে শোনে বিনি। শোনে, বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোলে পাড়চাপা গুমরানি। তাকিয়ে দেখে অভয়ের বুকটা।
অভয় বলে, ‘আমার কাজে মন বসে না। মনটা যে কোথায় থাকে।’ যেন না জানার জন্যেই দুজনে চোখে চোখ তাকিয়ে হাসে।
আর টুনি যেন এক দজ্জাল কিশোরী বৌ। তার ক্ষণে হাসি, ক্ষণে রাগ। তার হাসি অবাধ, আবার রাগও করবে। ছুটে ছুটে কাজ করবে। কাজের কি হল না হল তা দেখবে না। দিশেহারা কাজের মধ্যে সার হয় অভয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা। মনের মতটি না হলে ধমকাবে।
অভয় তার কাছটিতে বসে বলে, ‘এই তবে রইলুম বসে, থাকল মিলিটারি কারখানা আর চাকরি।’ টুনি অমনি খিলখিল করে হাসে। কখনো এলোচুলে, কখনো খোঁপা নেড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। দেখবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর থর থর কাঁপবে বাঁধভাঙা শরীর। অভয়ও মেতে ওঠে তার সঙ্গে। হাসে, রাগ করে। হয়তো আলগোছে টুনির ঘাড়ের কাপড় মাথায় তুলে ঘোমটা করে দেয়।
টুনি অমনি যেন সত্যি তীব্র অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকিয়ে চায়। চোখের কোণে বকুনি ও কান্নার ঝিলিমিলি খেলে।

অভয় বলে, 'কি হল টুনি ?'

কি হল তাই ভাববার চেষ্টা করে টুনি। কিছু টের পায় না, শুধু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে, অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর; নিজেকে দেখে, সে যেন অভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য লজ্জায় বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে ওঠে টুনি। বলে, 'কি জানি কি হয়, জানিনে ছাই।'

তারা কেউ জানে না তাদের কি হয়েছে। চারজনে ডুবে আছে আকণ্ঠ। নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা চারজন মানুষ।

অভয় না থাকলে সত্যি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সময় যেতে চায় না। তিনজনের বুকে একই তাল। চোখে একই জিজ্ঞাসা। তিনজনেই সারাদিন কান পেতে শোনে পদশব্দ। এই সুযোগে তাদের চাপাপড়া প্রাণের অস্থিরতাটা যেন ফিরে আসতে চায়। টুনি হয়তো গুন্ গুন্ করে ওঠে :

আর রইতে নারি হয়ে নারী,
তোমার বাঁশি শুনে গো।
আর চলতে নারি হয়ে নারী
একি বিষম দায় গো।

বিনি তাতে গলা দেয়, নিমি সব ভুলে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বেজে ওঠে সেই পদশব্দ। বাজে যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

অভয় তিনজনকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। একজনকে ভাবতে গেলে আর একজন আসে। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। এর মমতা, ওর হাসি, তার অভিমান। তিনে মিলে যেন একটাই।

তবু একটা নয়। এ সংসারের বিচিত্র নিয়মের মতো তিন বোনের আলাদা সত্তা যেন তলে তলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তাদের প্রাণের আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। অভয়কে তারা তিনজনে তিন রকমে টানে।

এমনি সময় একদিন বেলা দশটায় অসময়ে গলিতে বেজে উঠল বুটের শব্দ। অসময়ে কেন। একে একে সব ফেলে ছুটে এল তিন বোন। দেখল শিকল দেওয়া বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে। কি হয়েছে, অসুখ? বাড়ির দুঃসংবাদ?

অভয় তাকায় তিনজনের দিকে। ফিক ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যায় বুক। বলতে গিয়ে কথা ফোটে না মুখে। চোখের দৃষ্টি নেমে আসে। ভাবে, যাক বলব না। সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, পারব না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ। ওদের যে আর কেউ নেই। সে বলে, যেন চেপে আসা গলায় কোন রকমে বলে, 'ট্রান্সফার, মানে বদলি করে দিলে, পানাগড় ডিপোতে!'

বদলি! সামনে তিন মেয়ের মুখ নয়, তিনটি প্রাণহীন মৃত মুখ। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ, চলৎশক্তিহীন। যেন বুঝেও বোঝেনি সমস্ত ব্যাপারটা।

হু হু করে হাওয়া এল গলিটার অন্ধ সুড়ঙ্গে। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া। কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতেই

মেঘলাভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুক্ষতায়।

অভয় বলল, 'যেতে হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। কালকেই জয়েন করতে হবে।'

'যেতে হলে নয়, যেতে হবে। দুরন্ত হাওয়ায় সেই কথাটি যেন মর্মে মর্মে এসে বলে দিয়ে যায়।

নিমি, বিনি, টুনি—তিন বোন। ওদের চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমকে রয়েছে চোখে। বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলে আসছে।

অভয়ও আর তাকাতে পারে না। বুকটা মুচড়ে তারও গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। কোন রকমে দরজাটা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফিরে আসে সেই অস্থিরতা। অদৃশ্যে সে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে ঘরে বাইরে। ছটফট করে মরে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে।

সব গোছগাছ হয়ে যায়। সেই সুটকেস আর বিছানা।

তিন বোন বুক চেপে দেখে উনুন, কড়া, খুন্তি, হাঁড়ি। সেগুলিও যেন তাদেরই মতো রুদ্ধ যন্ত্রণায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের গড়া ঘর। খেলা ঘর। যাকে ঘিরে এই খেলাঘর সে চলে যায়, এগুলি পড়ে থাকে তাদেরই মতো।

তারপর অভয় আবার দাঁড়ায় তিন বোনের মুখোমুখি। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, ঠোঁট বেঁকে ওঠে। খালি শোনা যায়।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি তবে।'

এই তিনজনের বুকের মধ্যেও হাহাকার করে উঠল বিদায় দেওয়ার জন্যে। ঠোঁট কাঁপল, বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল। পারল না। হাত বাড়িয়ে বুঝি ছুঁতে চাইল, পারল না।

হাওয়া এল। শূন্য ঘর। ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির

মত শীর্ণ পাতাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কালকাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাঁশুটে কচুরিপানা।

একদিন যেমন এসেছিল, আজ তেমনি পোশাকে, তেমনি ঠেকে ঠেকে হাতে আর ঘাড়ে বোঝা, চলেছে অভয়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবই ঝাপসা।

মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবার তাকাল।

সেখানে এসেছে তিন বোন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে। কিন্তু চোখ অন্ধ হয়ে এসেছে, সামনে অন্ধকার।

অন্ধকার কানা গলিটাতে ঢুকে পড়ল অভয়। মোড়ের বাতিটা তাকিয়ে আছে এই দিকেই, এক চোখে।

তারপর হঠাৎ একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখল, দেয়ালের নোনা ইটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ী মা। কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

মজুরের স্বপ্ন

মদন চলেছে শহরে। মফস্বল শহর। লোকে বলে কলবাজার। মানে অনেক কলকারখানা রয়েছে সেখানে।

ভোর রাত্রে ঝিমোতে ঝিমোতে চলেছে ট্রেনটা। ন্যারো গেজ গাড়ি, কুল্লে চারটে বগি। ঘণ্টায় প্রায় আট মাইল গতিতে ঝুক্‌ঝুক্ করে চলেছে। তাও গদাইলস্‌করি চালে, হেলেদুলে চলেছে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো। গাড়ির শব্দ কী! যেন বিশ্ব কাঁপিয়ে চলেছে।

এখনো অন্ধকার। হেমন্তের আকাশে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা। কুয়াশায় ঘষা চোখের মতো তারার উঁকিঝুঁকি। উত্তুরে হাওয়াটাও বেশ মেতেছে। পাড়ার ছেঁচতলা, বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে রেল-লাইনটার দু-পাশে গাছ-গাছালির ভিড়। উত্তুরে হাওয়া সব রস টেনে নিয়ে পাতাগুলি একটা একটা করে খসিয়ে ছাড়ছে।

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উগরে গাড়িটা চলেছে। কামরাগুলি সবই অন্ধকার আর বেশীর ভাগ দরজাই বন্ধ। যাত্রীর সংখ্যাও খুব বেশী নয়, তবে মালের ভিড় খুব। চুপড়ির উপর বস্তা, বস্তার উপর চুপড়ি, নয়তো বাঁকের সঙ্গে চুপড়ি ঝুলানো। বেশীর ভাগই সব্‌জী। নতুন পালং, মূলো, বরবটি, কচু, পল্‌তা, ফুলফো আর ধনেপাতা, পেঁপে এই সব। যাত্রীও বেশীর ভাগ শহুরে পাইকের দোকানী। এসেছিল কাল সন্ধ্যায়, ভোরবেলা গিয়ে বাজারে বসবে সবাই। তা ছাড়া দু-চারজন চাষীও আছে। মাল নিয়ে চলেছে শহরের বাজারে। সংখ্যায় খুব কম। দু-চারজন এরকম বেচনদার চাষীও আছে। শহর বাজারের দরটাও

জানা যায়, আর শহরে মাঝে মাঝে আসাও ভালো, মনটাও চায়।

এমনি একটা অন্ধকার কামরার এক কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে মদন। চলেছে শহরে। পালিয়ে যাচ্ছে। না গিয়ে উপায় ছিল না। অনেক সহ্য করেছে, অনেক অত্যাচার আর উৎপীড়ন। এখনো গায়ে ব্যথা, মাথার চুলের গোড়ায় ছুঁচ ফুটছে। কেন, কি করেছে মদন। জোয়াল কাঁধে বলদের মতো সারাদিন খেটেছে। কি না করেছে! বেড়া বাঁধবে কে? না, মদন। মাঠের কাজে যাবে কে? না, মদন। গোরু চরাবে, তাও মদন। মায় ঘরকন্নার কাজ পর্যন্ত। অপরাধ কি? না, মদনের বাপ নেই। লোকে বলে, মায়ের চেয়ে সংসারে কেউ আপন নেই। আপন না ছাই। মা তার শত্রু। তুটো বছর হয়নি বাপ মরেছে, যেন মায়ের আপদ বিদেয় হয়েছে। সদা বোষ্টমই এখন তাদের সংসারের কর্তা। লোকেও কম গাল দেয় না তার মাকে। সদা বোষ্টমই নাকি তার মাকে খারাপ করেছে। ব্যাটা বোষ্টম না আর কিছু, বকধার্মিক। কি হয়েছে? না মদনের বাপ কিছু টাকা ধারত সদা বোষ্টমের কাছে। তাইতে সে ঘর বৌ ছেলে, সব কিছুর মালিক হয়ে গেল।

হতে পারে মদন কাঁচা ছেলে। তাও কি, চোদ্দ বছর বয়স হল। নেটো দিগারের ব্যাটা অনন্ত এই বয়সে বিয়ে করেছে। বেচা এই বয়সে ঘরের কর্তা। চরণ তো যাত্রাদলের কেষ্টঠাকুর। মদনও কি কিছু কম বোঝে। পাঁচ বিঘের উপর তাদের জমি, তুটো গাই গোরু, দশ বারো কাঠা জমির উপর বাড়ি। হলই বা সে খড়ো ঘর। গোটা সাতেক আমগাছ, গোটা তিনেক নারকোল। তাছাড়াও আছে অন্যান্য রকমের গাছ। আর এই তো সময়। পালং মূলোও যা হয়েছে

মন্দ নয়। আউশটাও কিছু কম পাওয়া যায়নি। ওসব হিসেব মদনের নখদর্পণে।

বাপের এত থাকতেও মদন ফকির। সবকিছু তদ্‌বির তদারক করে সদা বোষ্টম। তাদের যাবতীয় সংসারের ব্যাপার এবং তার মায়েরও। আর ধরে ধরে মারে মদনকে। যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। মদন কিছু বোঝে না বুঝি? মারবে আবার আধ-পেটা খেতে দেবে। হেই ভগবান, কতদিন ঢেঁকিশালে তাকে সদা বোষ্টম পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে রেখেছে। তার উপরেও আবার তার মা নাকে কেঁদে কেঁদে নালিশ করেছে, 'এই পাপের মড়া কবে মরবে। আপদ কবে বিদেয় হবে গো!'

কেন, আজ মদন কেন আপদ হল তোর। রাক্ষুসী, তোর ওই পেটে কি জন্মায়নি মদন। আজ তুই কি পেলি যে, পেটের ছা তোর পাপের মড়া হল। কেন সে তোর চক্ষুশূল হয়েছে। কি মন্ত্র তোকে পড়াল ওই সদা বোষ্টম। তোরই সামনে দাঁড়িয়ে সদা বোষ্টম মদনকে ফেলে ঠ্যাঙায়, চুল টানে, লাথি মারে। নাহক মারে। আর মা হয়ে তুই তখনো বলিস্ কিনা, 'তুই মর্!'

ট্রেনের অন্ধকার কামরার কোণে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মদন। লোকে টের পাবে ভেবে কাপড় গুঁজে দেয় মুখে। চোখের জল বাঁধ মানে না। মরবে, কিন্তু কি করে সে মরবে। একটা অসুখ-বিসুখ নেই, হুট্ করে ওলাউঠা ভেদবমি হলেও না হয় মরতে পারে। মরতে তো সে চায়। মরে না যে! নকু বৌয়ের মতো গলায় দড়ি দেবে! তা সে পারবে না। ভয় করে।

তার দুঃখে পাড়ার মানুষ কাঁদে। মদনের মনে হয়, নির্জন ঝোপের ওই পাখিগুলো কুরুর্ কুরুর্ করে ডাকে, তারই দুঃখে। হাওয়ার বুকেও

সে শোনে তার কান্না।

এত আর সহ্য হয় না, তাই সে চলেছে শহরে। বড় ভয় ছিল শহরকে। ওই কলবাজারকে। কুলি-মজুর-চোর-ছ্যাঁচড়-বদমায়েশদের জায়গা। লোক ঠকে সেখানে পদে পদে। কিন্তু ভয় করলে আর চলে না। ভয়ের মুখে ছাই দিয়ে এসেছে সে। হ্যাঁ, শহরে সে রোজগার করবে। আঁটঘাট বেঁধে আবার ফিরে যাবে গাঁয়ে। দেখবে একবার সদা বোষ্টমকে। এক কণা ধান, একটা পাইও সে ছাড়বে না। সেও মুকুন্দ চাষার ব্যাটা মদন। তাকে ঠকাবে কে?

যেন মনের জেদে জোরে জোরে চোখের জল মোছে সে। কোমরে হাত দিয়ে একবার আঁচ করে নেয় টাকার পুঁটুলিটা। এখনো কুড়ি টাকা আছে তার। চার মন ধান বেচে দিয়েছে সে। সদা বোষ্টম বা তার ওই পেটে ধরা ডাইনী মা টেরও পায়নি। পেলেই বা। নিজেরটা, বাপেরটা বিক্রি করেছে সে।

ফরসা হয়ে আসছে আকাশ। এবার আসবে জংসন স্টেশন। তারপর আবার বড় লাইনের গাড়ি। সেই গাড়িতে করে একেবারে শহরে। শহর। গাঁয়ের থেকে শহরে আসে লোকে পয়সা রোজগার করতে। আরে বাপ্‌রে। কী পয়সার আমদানি। তবে খবরদার, কাছাটি ঢিলে করেছ তো গেল। ট্যাঁকে যেটি আছে, সেটিও যেতে কতক্ষণ। মায় গায়ের জামাটিও গায়ে থাকবে না।

তবে হ্যাঁ, দু-দিন থাকলেই চড়কো হয়ে যাবে। এক কুড়ি নিয়ে চলেছে মদন। একে সে দু-কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি, একেবারে দশ কুড়ি না করে আর ফিরছে না। খালি রোজগারের পন্থাটা একবার দেখে নেওয়া। চাই কি, দু-চার বিঘে জমি নিজেই কিনে ফেলবে সে। তার ট্যাঁকের কড়ি সে সহজে খসাচ্ছে না।

কামরার মধ্যে কে একজন আর একজনকে ভাঙা ভাঙা চাপা গলায় বলছে, 'এই যে তোমার বিষ্টিটে হল, আর দু-দিন হলে অবশ্য খুবই ক্ষতি হত, কিন্তুন্ মুলো বেগুনের দামটা বাজারে খুব চড়ত। মালটা ঠিক-মতো রাখতে পারলে বাজারে একেবারে শালা ঘুঁগড়োবান ডাকিয়ে ছাড়ত।' জবাবে একজন হুঁ দিয়ে কেশো গলায় হাসল একটু। ওসব মদনও জানে। মাল কম হলে দাম তো চড়বেই। কম মাল দিয়ে বেশী পয়সা পেলে কার না আনন্দ হয়।

গাড়ি বদলে আধঘণ্টার মধ্যেই মদন শহরে এসে পড়ল। শহর দেখে অবাক হওয়ার মতো কিছুই ছিল না। মদন এর আগে এখানে কয়েকবার ঘুরে গেছে। শহর আর কি। খালি কলকারখানা। ঘিঞ্জি বাড়ি আর অজস্র টালি খোলা ছাওয়া বস্তির ভিড়। আর লোকের পেছনে কাটি দেওয়ার জন্যে কতগুলি শহুরে বদমাইশের মেলা। পয়সা লুফে নেওয়ার জন্যে বাড়িয়ে আছে হাত। কোথায় বাড়িয়ে আছে, নজর রাখতে না পারলেই গেল। সদা বোষ্টম শহুরে হলে যা হত আর কি ! অতএব, খুব হুঁশিয়ার। বাপের দেওয়া সুতি-কোটটি একেবারে ছোট হয়ে গেছে। সেটিও মদন টেনে আরও চেপেচুপে নেয়। সন্তর্পণে একবার অনুভব করে ট্যাঁক। তারপর বেরিয়ে আসে স্টেশন থেকে।

এবার কাজ। কাজ কোথায় পাওয়া যায়। কাকে বলা যায়! কারখানার গেটগুলি দেখলেই তো পিলে চমকে ওঠে। তার উপর ভেতরে নাকি সব গোরা সাহেব। কথা বলাই তো দুষ্কর। একটা ভালো বাবু জোগাড় হলেই সবচেয়ে ভালো। কেঁদে ককিয়ে পড়লে একটা হিল্লে হয়েও যেতে পারে। আর হিল্লে একবার হলে—। থামল মদন। ঝুন্ ঝুন্ করে কাঁচা পয়সার শব্দ শোনা যাচ্ছে কোথায়! সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। অমনি নজরে পড়ল একটা লোক তার দিকেই

তাকিয়ে আছে যেন। হুঁ! স্মুন্দির পো নির্ঘাত পকেটমার। কিন্তু পয়সার শব্দটা কোথা থেকে আসছে! দান-ধ্যান হচ্ছে নাকি কোথাও। শহর তো! হলেই হল।

পয়সার শব্দটা লক্ষ্য করে যেতে গিয়েও মদন দেখল, সেই লোকটা এখনো যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা তো ভালো নয়। মদন আড়চোখে ভালো করে নজর করে দেখল। ও হো! লোকটা আসলে ট্যারা। তাকিয়ে আছে দূরের একটা ভিখিরি মেয়েমানুষের দিকে।

সামনেই একটা গলির মধ্যে পয়সার ঝনাৎকার শুনে সেখানে ঢুকে পড়ল সে। দিনের বেলাও গলিটা অন্ধকার। একটা সুড়ঙ্গের মতো পশ্চিমে চলে গেছে গলিটা। দু-পাশে বেঁকে দুমড়ে এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে খোলার ঘর। সুদীর্ঘ চালার সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে আলো। খানিকটা রাবিশের ডাঁই। তার ঢালু নীচেই চক্‌চক্ করছে হেমন্তের গঙ্গার জল।

গলিটাতে ঢুকেই ডানদিকে খানিকটা খোলা যায়গায় অনেকগুলি মানুষ দেখে চমকে দাঁড়াল মদন। খোলা জায়গাটা উঠানের মতো দেখতে, আসলে বেওয়ারিশ। সমস্তটাই সমুদ্রের মতো দিগন্ত-বিস্তৃত ঘন বস্তির সমাবেশ। সমুদ্রের উপর আকাশ আছে, এখানে তা নেই। সমুদ্রের তলার মতো শ্বাসরোধী অন্ধকার। আর মানুষগুলি সবই প্রায় মদনের মতো কম বয়সের মানুষ। দু-একটা বড় মানুষও আছে আর আছে একটা মেয়ে। ছোট মেয়ে। লক্ষ্মী পিসির বারো-তেরো বছরের মেয়ে বিমলির মতো ডানপিটে মনে হচ্ছে।

তারা সবাই ঝুঁকে পড়েছে গোল হয়ে। সেই ব্যূহের ভেতর থেকেই আসছে পয়সার শব্দ আর একটা চাপা মোটা গলা, 'আপ্‌না তক্‌দির,

নসিব, কিস্‌মত তুহার বেটা। যেত্‌না ফেকেগা, উস্‌কো ডবল মিলেগা। যত দেবে ডবল মিলবে। দু-পয়সায় চার পয়সা, দু-আনায় চার আনা, এক রুপেয়াতে দু-রুপেয়া।' জুয়া! সিঁটিয়ে গেল মদন। তবু এক পা এক পা করে এগুল সে। কি রকম! মানে, দিলেই পাওয়া যায় নাকি? তবে তো মা চণ্ডীর নাম নিয়ে···। কিন্তু বড় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে বুকের মধ্যে। কোমরটা শক্ত করে ধরে এগুল সে। চিল-চোখো কটা কটা মেয়েটা চেঁচাচ্ছে, 'রোখ্‌ যা, রোখ্‌ যা বেটা।' আর উরুত চাপড়াচ্ছে, ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ছে। কাপড়টা বেঁধেছে গাছকোমর করে, গায়ে একটা ছেঁড়া হাফ-শার্ট। হাট করে খোলা বুকটা। রাক্ষুসীর মতো চুলগুলি হয়েছে শন নুড়ি।
তার পাশে আরও তিনটে ছেলে, বোধ হয় একই বয়সী। বারো-তেরোর উপরে নয়। চেহারা দেখে বয়স বোঝবার জো নেই। কারো কানে কারো মুখে বিড়ি। খড়ি ওঠা লিকলিকে হাত-পা। গায়ের জামাগুলি আর জামা নেই, এক তরো। পরনে হাফ নয়তো ফুল প্যান্ট, গলায় আবার রুমালের মতো ন্যাকড়া বাঁধা। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা দেখে মনে হয় ভারি ওস্তাদ আর বাহাদুর ছোকরা সব। মাথার চুলগুলি কচুরিপানার শুকনো শিকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে কপালে। তারাও চেঁচাচ্ছে মেয়েটার সঙ্গে, একজন বাদে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, বয়সকে বলে, ওদিকে থাক। তার চেয়ে দেখেছি বেশী, জেনেছি অনেক। খুব গম্ভীর মুখে, চোখ কুঁচকে সে দেখছে মেয়েটাকে।
মদন ভাবল, পাকা বদমাইশ সব কটা। নির্ঘাত পকেট মেরে বেড়ায়। ঠিক সেরকমই দেখতে। দেখে খুব ওস্তাদ মনে হচ্ছে। যেন যমেরও অরুচি।

বাদবাকি ছোঁড়াগুলি মজা দেখছে এদেরই ঘিরে। কয়েকটা বয়স্ক লোকও। অদূরে একটা ঘরের রক থেকে চেঁচাচ্ছে একটা আধবুড়ী মেয়েমানুষ 'ফের খেলবি তো শোরের বাচ্চা, তোর গলায় পা দেব।' কিন্তু কেউ সেদিকে কান দিচ্ছে না। কে একজন খালি বলছে, 'শালা এবার ঠিক সেপাই এসে পড়বে।'

সেপাই! মানে পুলিস। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল মদনের। তাকেও যদি ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এক টাকায় দু-টাকা। আর যদি সে তার এক কুড়িই রাখে তবে দু-কুড়ি উঠে আসবে। চাই কি, সেই দু-কুড়িতে আবার চার কুড়ি। ওরে বাবা, তার মানে একদিনেই দশ কুড়ি নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। আর নিজেই সে জমি কিনে বসতে পারে।

তাকে লক্ষ্য করছে কয়েকটা ছেলে। বিশেষ, ওই তিন ছোকরার মধ্যে সবচেয়ে গম্ভীর চালাক ওস্তাদ ছোঁড়াটা।

কিন্তু ইতিমধ্যে জুয়ার গোল প্লেটে ঘড়ির কাঁটার মতো ভাগ্যের কলটা ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে দাঁড়াল, সেই ঘরে কেউই কিছু পয়সা রাখেনি। ফলে, পয়সাটা উঠল জুয়াওয়ালার পকেটে।

এক মুহূর্তের একটা হতাশা। পরমুহূর্তেই আর একটা জেদ চেপে বসল। এই জেদের উত্তেজনাটা সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে। কেবল সেই ছোঁড়াটা আরও রেগে উঠেছে। কি সব বিড়বিড় করছে। বলছে, 'ফের? দুনি ফের?'

কিন্তু দুনি তার কোমরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে ঠোঁট আর চোখ ফেটে এসেছে জল। বাকি ছেলেদুটোর অবস্থাও তাই। তারা তিনজনেই আবার প্লেটে পয়সা রাখল।

শুধু গম্ভীর চাপা গলায় হেঁকে চলেছে জুয়াওয়ালা, 'যেত্‌না ফেকেগা,

ডবল মিলেগা, ডবল কে দেবে, দিয়ে দাও, আখেরি চানোস।'
কি করবে মদন। দেবে নাকি? শঙ্কিত মুরগির মতো পায়ে পায়ে সকলের মধ্যে চলে এল সে।
আবার কল ঘুরল। সেই ছেলেটা বেরিয়ে গেল দল থেকে। গিয়ে একটা কোণে যেখানে কতগুলি বস্তা, চুপড়ি আর লোহার খুন্তি জড়ো হয়ে আছে সেখানে বসে পড়ল। আর লক্ষ্য করতে লাগল মদনকে। মদনের চোখ পড়তেই ছোঁড়াটা সদা বোষ্টমের চেয়ে কড়া গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'ভাগ্ শালা! প-সা কুট্ কুট্ করছে বে পাকিটে। দেবে শালা একেবারে ঢিলে করে!'
ধ্বক্ করে উঠল মদনের বুকের মধ্যে। ড্যাকরাটা টের পেয়েছে ঠিক, তার পকেটে টাকা আছে। নইলে···। কিন্তু ভাগিয়ে দিতে চাইছে কেন? মারবে নাকি? বিশ্বাস কি। সরে পড়া যাক।
তবু সে সাহস দেখাবার জন্যে মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল। তারপরে হঠাৎ বলে ফেলল, 'কোথায় পয়সা, আমি তো দেখ্ছি।'
'ঘর কোথায় তোর?'
ঘর! ছেলেটার গলাটা রূঢ় কিন্তু আরো কিছু ছিল। মদনের ঘরছাড়া শোক উথ্লে উঠল হঠাৎ। তার মুখে চোখে ফুটে উঠল একটা শান্ত অসহায় চাষী ছেলের দুঃখের ছাপ।
আবার একটা চিৎকার উঠল, 'রোখ্ যা, রোখ্ যা বেটা।' ওই ছেলেদুটো বলছে। আর দুনি ঢোঁক গিলছে। কান্না চেপে চোখের জল মুচছে।
সেই ছেলেটা আবার উঠে এল। কিন্তু এবারও ভাগ্যের কল বেজায়গায় দাঁড়াল।
দুনি এবার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। তবু আবার কোমরে হাত ঢুকিয়ে

দিল। অন্য ছেলেদুটো কাঁদতে পারছে না। কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে ও ব্যথায় বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছে দুনির দিকে।

দুনি পয়সা বার করতে যাবে এমন সময় সেই ছেলেটা এসে খপ করে তার চুলের মুঠি টেনে ধরল। ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে।

একটা হট্টগোল চিৎকার উঠল। মেয়েটা চিলের মতো চেঁচাচ্ছে, 'ছোড়দে, ছোড়দে, শুয়ারকা বাচ্চা জুয়াওয়ালাকে আমি ছাড়ব না। ছোড়্, ছোড়্।' ছেলেটা ওকে টেনে এনে ফেলল একেবারে চুপড়িগুলির উপরে। বলল, 'ফের? শালা ঘরের প-সা নষ্ট করবি? হারামজাদী খাবি কি?'

দুনি তবু চিৎকার করে কাঁদছে। বাকি ছেলেদুটো ভীত কুকুরের মতো সেঁটে গেছে এক কোণে। জুয়াওয়ালা প্লেট ঘাড়ে করে সরে পড়ছে তাড়াতাড়ি।

মদন দিশেহারা হয়ে গেছে। কি ব্যাপার। সত্যি পুলিস এল নাকি? হে ভগবান! জয় মা কালী। তাহলে কি করবে মদন। মেয়েটাকে মারছে কেন? চুরি করেছে নাকি? নাকি ওই ছোঁড়াটার বোন?

দুনি পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করছে সারাটা জায়গা জুড়ে। আর ছেলেটা একটা কালো হনুমানের মতো দাঁত বের করে চেঁচাচ্ছে, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্, বানচোত্ এখন ওর মায়ের ভয়ে এরকম করছে। কে তোকে জেদ করে প-সা খরচা করতে বলেছে অ্যাঁ? ফের কাঁদবি, মারব লাথি। ওঠ্ ওঠ্ বলছি।'

বাদবাকি সকলে ততক্ষণে চুপড়ি বস্তা খুন্তি নিয়ে ছুটে চলেছে গলির সুড়ঙ্গটা দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেদুটো। পুনিয়া আর কালু।

পুনিয়া স্তিমিত গলায় বলল, 'বাচ্চা, জল্‌দি চল।'
'জল্‌দি চল!' সেই ছেলেটা খেঁকিয়ে উঠল। নাম তার বাচ্চা। বোঝা গেল সে এ দলের শিরোমণি। বলল, 'তোরাই তো শালা আগে খেলতে লেগেছিস।'
কালু আর পুনিয়া চুপ হয়ে গেল। বেশী কিছু বললে বাচ্চা ক্ষেপে যাবে। বাচ্চাও খেলে। তবে, আজ ওর পকেট খালি। তাছাড়া বাচ্চা খেলে খুব কম।
ছুনি অর্থাৎ ছুনিয়া চিল-চোখে জল নিয়ে তখন হেঁচকি তুলছে। দেখে বাচ্চার শির-ওঠা চিমড়ে-খাওয়া মুখটাতে অবিশ্বাস্যরকম হাসি ফুটে উঠেছে। সে হঠাৎ কোমর দুলিয়ে নেচে নেচে গান ধরে দিল,

এক আনাতে দু-আনা, দু-আনাতে চার আনা,
মায়ের চোটে কেঁদে কেঁদে আর্না আর্না করো না।

ছুনি আরো জোরে কেঁদে উঠল। হেসে উঠল পুনিয়া আর কালু। তারপর বাচ্চা ছুনিয়ার হাত ধরে টেনে তুলে বলল, 'চল্‌ জল্‌দি, এ বেলার মধ্যে পয়সাটা উশুল করবি।'
ছুনি বলল, 'মা পিটবে।'
'পিটবে তো কি, মরে যাবি? বলে, পিটুনি খেয়ে শালা শক্ত হয়ে গেলি, তোর আবার পিটুনি। চল্‌ চল্‌।'
তারা চারজনেই বস্তা খুন্তি নিয়ে উঠল। বাচ্চা ফিরে তাকাল মদনের দিকে। মদন তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয় থাকলেও একটা কৌতূহল তাকে আটকে রেখেছে। এরা নিশ্চয়ই কোথাও পয়সা রোজগার করে। হয়তো চুরি করে কোথাও। যদি জানা যায়, যদি কোনরকমে একটা পন্থা মিলে যায়।
বাচ্চা তার সামনে এসে বুকে ফুলিয়ে দাঁড়াল। তাচ্ছিল্য ভরে জিজ্ঞেস

করল, 'গাঁয়ের থেকে এসেছিস্, না?'

মদন ঘাড় নাড়ল।

বাচ্চা মুখটাকে বিকৃত করে আবার জিগ্‌গেস করল, 'এবার ভিখ্ মাঙ্‌বি শহরে, না?'

মদন সন্দেহান্বিত চোখে তাকিয়ে রইল বাচ্চার দিকে। তারপর করুণ হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বলল, 'তা নইলে খাব কি?'

কালু বলে উঠল, 'এঃ, আবার কোট পরেছে।'

মদনের বুকের মধ্যে একটা ভয়ানক কিছুর জন্য ধুকধুক করছে। বাচ্চা তার হাতের বস্তা আর খুন্তিটা মদনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'চল্ আমাদের সঙ্গে, চল্।'

মদন বলল, 'কোথা?'

দুনি ভেংচে বলল, 'যমের বাড়ি। যাবি তো চ।' বলে তারা সবাই গলি ধরে পশ্চিমে চলল।

লক্ষ্মী-পিসির মেয়ে বিমলির কথা মনে পড়ছে দুনিকে দেখে। তবে দুনি আরও সাংঘাতিক্। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে তাকে। যদি কেউ মারে কিংবা পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। আর গেলে কি রোজগার করা যাবে। রোজগার করতে এসেছে মদন। তারও জমি চাই। খালের ধারে, সোনার মতো মাখনের মতো জমি।

বাচ্চা খেঁকিয়ে উঠল, 'আয় না। পেটে খাবি তো খাটবি। চলে আয়।'

মদন ভয়ে কৌতূহলে আর লোভে খুব সন্তর্পণে এগুল। ট্যাঁকের কড়ি হুঁশিয়ার। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেলেও খসাবো না। দুঃখের অত্যাচারের শোধ নেব, তবে ছাড়ব।

অন্ধকার গলিটার ভেতর দিয়ে তারা এসে পড়ল গঙ্গার ধারে।

হেমন্তের ভাটাপড়া গঙ্গা টলটল করছে। গান গাইছে ছল্‌ছল্‌ করে। সকাল বেলার আকাশে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ।
এই গঙ্গায় স্নান করার জন্য মদনের গাঁয়ের মানুষেরা পাগলের মতো ছুটে আসে। ভগবতী গঙ্গা। কিন্তু এখানে কি হবে।
বাচ্চাদের দলটা এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। মদন তাকিয়ে দেখল, অদূরেই একটা বিরাট কালো পাহাড় উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। আর সেই পাহাড়ের গায়ে অজস্র মেয়েপুরুষ বাচ্চা বুড়োর ভিড়।
কি ব্যাপার। কি আছে ওখানে। মদন জিগ্‌গেস করল, 'কি হচ্ছে ওইখেনে?'
বাচ্চা বলল, 'কয়লা কুড়োচ্ছে। আমরাও কুড়োব। বিজলী কারখানার বয়লারের ঘেঁষ ওগুলো, বুঝলি। বেছে বেছে কয়লা তুলবি, আর পাড়ায় পাড়ায় বেচবি?'
মদন অবাক হয়ে বলল, 'কয়লা তুললে কেউ কিছু বলবে না? মাগ্‌না তুলতে দেবে?'
'হ্যাঁ, মাগ্‌না।'
'পয়সা পাওয়া যায়?'
'তবে কি এমনি? যে যেমন তুলতে পারবে। চার আনা, আট আনা, এক টাকা।'
সত্যি! মদনের বুকের মধ্যে উল্লাসের বান ডাকে। যত খুশি তোলা, তত খুশি বেচা? সারাদিন, সারারাত তুলবে মদন। খাটতে ভয় পায় না সে। বলদ পিটে মাঠে লাঙল দিতে পারে, কাঠা কাঠা জমি কোপাতে পারে। আর পয়সার জন্যে কয়লা তুলতে পারবে না!
সত্যি, এদের তুলনায় তার শরীর এখনো শক্ত সুঠামও বটে। যতই দুশ্চিন্তা থাক্‌ তার চোখে একটা আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ঝক্‌ঝক্‌

করছে। তাহলে তার দশ কুড়ির স্বপ্ন ফলবে। সত্যি, কিন্তু খুব সামলে। কেননা, এদের বিশ্বাস নেই।

ঘেঁষের পাহাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে এদের সঙ্গে। বাচ্চা তার কয়লা তোলা ক্ষতবিক্ষত হাতজোড়া দিয়ে দেখিয়ে দিল কিভাবে কয়লা তুলতে হয়। কোন্‌টা কয়লা, কোন্‌টা ঘেঁষ, কোন্‌টা পাথর আর ইঁট। ছুনিয়া নিজে কয়লা তুলে তুলে দিল মদনের বস্তায়।

সবাই হন্যে হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোলের শিশু পাশে রেখে কয়লা কুড়োচ্ছে মা। কারো কাপড় আধখোলা। কিন্তু সোনার সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছে সব। কয়লা নয়, পোড়া ছাইয়ের মধ্যে ছোট ছোট সোনার ড্যালা যেন।

মদনের হাত অব্যর্থভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কয়লা তুলছে। চিনে ফেলেছে সে। বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। ছুনি-পুনিয়া-কালু-বাচ্চা, সবাই হাসছে। রোদের তাত ফুটেছে। তারা ঘেমে উঠছে। মুখগুলি পোড়া ছাই হয়ে উঠেছে। তবু তারা খিলখিল করে হাসছে মদনকে দেখে। বাঃ বাহাদুর মদন। তোল্‌ তোল্‌।

বস্তা ভরে উঠতে উঠতে হেমন্তের সূর্য একটু ঢল খেয়ে গেল। এবার বিক্রি। মদনকে নিয়ে তারা চারজন উঠে পড়ল। কিভাবে চেঁচাতে হবে, কি রকম দাম চাইতে হবে আর শেষ পর্যন্ত কি দামে বিক্রি করতে হবে, সব শিখিয়ে দিল মদনকে। খবরদার, কম দামে বেচলে পরের ক্ষতি। তবে হ্যাঁ, একেবারে না বিক্রি হলে তখন দেখা যাবে।

তারপর পাড়ায় ঘোরা। কয়লা! কয়লা চাই! মদনের খদ্দেরই আগে জোটে। তার বোরাটা একটু বেশী ভারি দেখা যাচ্ছে, একটু বেশী মোটা। কত? এক টাকা। ভাগ্‌! আট আনা দিবি? না। দশ আনা? না, এক টাকা। এক টাকা। তারপর বারো আনায় রফা।

বারো আনা! একটা আধুলি আর একটা সিকি চক্‌চক্‌ করে উঠল মদনের হাতের চেটোয়। তার মানে এক কুড়ি বারো আনা। এইভাবে সে কুড়ি কুড়ি তুলে ফেলবে। কুড়ি কুড়ি!

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। তারা আবার এসে বসল গঙ্গার ধারে। কালো হয়ে আসছে গঙ্গার জল।

বাচ্চা বলল, 'হাঁপিয়ে পড়েছি, চল্‌ একটু জিরিয়ে নিই। কিছু খেতে হবে।'

জিরিয়ে! মদনের হাত নিশ্‌পিশ করছে। কেন, জিরোব কেন? তবে হ্যাঁ, বড় খিদে পেয়েছে। কিন্তু খেলে তো পয়সা খরচ হয়ে যাবে। আর খাবার কিনলে ওরাও যদি চায়।

একটা ফুলুরিওয়ালা হাঁকছে। রাস্তার ফুলুরিওয়ালারা এসেছে। রাস্তার চেয়ে এখানেই এখন বিক্রি বেশী। ফুলুরির পাত্রের সঙ্গে কেরোসিনের জলন্ত ডিবে বসানো। যেন একটা মশাল ঘুরছে।

বাচ্চা হাঁকল, 'এই ফুলুরি, এই, এদিকে আয়।'

নিজের পয়সা দিয়ে চার আনার কিনে ফেলল সে। নির্বিকারভাবে ছাই-মাখা হাতে ভাগ করে দিল সবাইকে। সবাই খেতেও লাগল নির্বিকার-ভাবে। কেবল মদনের অস্বস্তি লাগল। খাবে। খেলে আবার খাওয়াতেও হয়। কিন্তু খাওয়ালে তার চলবে কি করে?

বাচ্চা খেঁকিয়ে উঠল, 'খা-না। উঁ, বাবুর আবার সরম হচ্ছে।'

কালু বলল, 'আর না খাস্‌ তো দে, দিয়ে দে শালা।'

আবার তারা সবাই হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ করে। ছোঁড়াটা একেবারে গেঁয়ো ভূত। একেবারে ভালোমানুষপনা। গাঁয়ের ছেলে কি না!

বাচ্চা জিগ্‌গেস করল, 'মদন, কে কে আছে তোর ঘরে?'

মদনের ঘরে! সন্ধার গাঢ় ছায়া চেপে এল মদনের চোখে। টন্‌টন্‌ করে

উঠল বুকটা। বলল, 'মা আছে।'

ঢুনি বলল, 'মা! মাকে ছেড়ে চলে এসেছিস?'

হ্যাঁ। পালিয়ে এসেছে সে। কিন্তু কেন? তার ফেলে-আসা জীবন, তার মৃত বাবা, তার মায়ের পীড়ন, সদা বোষ্টমের অত্যাচার সব মনে পড়ে গেল একে একে। হঠাৎ চোখ ফেটে জল এল তার। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অনেক সয়েছে সে। প্রাণটা তার ছট্‌ফট্ করে উঠল। সে সব-কথা বলে গেল এদের কাছে। কেমন তার মা। কত মার খেয়েছে সে।

হয়তো এই দুর্বিপাক, এই পীড়ন বাচ্চাদের কাছে খুব বড় কিছু নয়। তবু তাদের বুকগুলি টন্‌টন্ করে উঠল। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া—গঙ্গার তীরে বসে যেন ডুবে গেছে বেদনার অতলে।

বাচ্চা হাত দিয়ে মদনের ঘাড় ধরে তাকে কাছে টেনে নিল। বালিকা ঢুনিয়া মায়ের মতো ছাইমাখা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিল মদনের চোখ। পুনিয়া বলে উঠল, 'তোর মা-টা তো বড় খচ্চর।'

কালু বলল, 'মাইরি, ওই সদা বোষ্টম শালাকে রাস্তায় ন্যাংটো করে দিতে হয়।'

ঢুনিও গর্জে উঠল, 'সত্যি, মাইরি।'

গঙ্গার ধারটা নির্জন হয়ে এসেছে। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বাচ্চার গলাটা গম্ভীর বুড়োটে শোনাল, 'এ শালার জগতটা বড় অদ্ভুত। নিজের মাও বিগড়ে যায়। মদন, তুই আর ফিরে যাস্‌নি।'

ঢুনির বড় ভালো লেগে গেছে ভালোমানুষ গেঁয়ো মদনকে। সে বলল, 'আমাদের ঘরে তুই থাকবি, আমার মা তোকে কিছু বলবে না। বাচ্চাও আমাদের ঘরে থাকে, আমার মা ওকে খুব পেয়ার করে। ওর কেউ নেই কি না!'

কিছুক্ষণের জন্যে মদন সত্যি তার টাকার কথা ভুলে গেল। এত ভাল-বাসা, এত বন্ধুত্ব সে আশা করেনি। সে ভাবতে পারেনি একদিনের মধ্যে কেউ কাউকে এতখানি আপন ভাবতে পারে। এত কাছে টানতে পারে।

তার সংশয়ান্বিত সংকীর্ণ মনটা শহরের ছাইগাদার এ রূঢ় পরিবেশেও ভিজে উঠল। সে খুলে দিল তার মনটাকে। বলে ফেলল তার গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা, সে কি চায়। সে চায় জমি। তার নিজস্ব জমি। তা নইলে এ জীবনে বেঁচে থেকে তার সুখ নেই।

অদ্ভুত! ছাইগাদার বাচ্চারা অবাক। তারাও বোধ হয় ভাববার চেষ্টা করে নিজস্ব খানিকটা জমির কথা। কিন্তু ভাবাই যায় না। নিজের বলতে যাদের কিছুই নেই, তারা হবে জমির মালিক। তাদেরই সমবয়সী এক ছেলের কাছ থেকে তারা যেন এক কল্পলোকের গান শুনছে। সত্যি, মদন যদি জমি পেয়ে যায়, তবে কি অদ্ভুত ব্যাপার হবে। তারা সকলেই মহাভাবিত হয়ে পড়ল। পাওয়া চাই, কিন্তু টাকা! অত টাকা কোত্থেকে আসবে! মদনকে দেওয়ার মতো তো টাকা তাদের নেই। আচ্ছা, আন্‌কা রোজগার হলে সেটা তারা মদনকে দিয়ে দিতে পারে।

মদনকে ঘিরে তাদের চার বন্ধুর একটা নতুন বাসনা মূর্ত হয়ে উঠল। মদন তাদের আর একজন। তারা পাঁচজন।

মদন সব বলেছে। বলেনি এক কুড়ির কথা। বলতে নেই। তাহলে তো সবই ফাঁস হয়ে গেল। আরে বাপ্‌রে, চোর-ছ্যাঁচড়ের জায়গা। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে তার শরীরটাও চুরি হয়ে যেতে পারে এখানে। এখন কয়লা বাছা। কিন্তু তাকে আরও নতুন পন্থা বেছে নিতে হবে। আরোও বেশী রোজগারের ফন্দি আঁটতে হবে।

ছাই-পাহাড়ে আগুন লেগেছে। মশাল জ্বলছে এখানে সেখানে। নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। আকাশে ফুটেছে নক্ষত্র। গঙ্গার তীব্র স্রোতে নক্ষত্রের বাঁকা ঝিলিক।

ছাইগাদার মানুষগুলিকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। যেন কতগুলি ঘাপটি-মারা জন্তু নুয়ে পড়ে কবর খুঁড়ছে। মশালগুলি দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধকার জঙ্গলের বুকে নিশাচর ডাকাতেরা আক্রমণের আয়োজন করছে।

একটা মশাল এগিয়ে আসছে গঙ্গার ধারে। একটা আধাবয়সী বুড়ি আর কতগুলি কালো কুত্‌কুতে বাচ্চা আসছে এদিকে। বুড়িটা চিৎকার করছে, 'দুনি, হারামজাদী দু-নি রে।'

দুনির মা ডাকছে। দুনিরা সবাই উঠে গেল। এবার শেষ চুপড়ি ভরতে হবে। আজকের মতো শেষ। হাজার হাজার পায়ের ছাপ ও গর্ত নিয়ে একটা বিশালকায় কালো জন্তুর মতো সারারাত পড়ে থাকবে ছাইগাদাটা। আবার কাল ভোরে শত শত শেয়ালের মুলোর মতো হাত পড়বে!

মদন এদের সঙ্গে ফিরে এল বস্তিতে। ঘর নয়, একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে দুনি আর বাচ্চার সঙ্গে। সেখানে দুনির মা, আরও কতগুলি বাচ্চা। তারা সকলেই কয়লা কুড়োয়। অথচ দুনির বাপ নেই।

দুনির মা রাগ করল না মদনকে দেখে। সন্দেহ করল না একটুও। খালি বলল, 'খবরদার বাপু, জুয়াওয়ালার খপ্পরে পড়িসনে কখনো।'

মদন দেখল, ঘরটার অর্ধেক জুড়ে বাছা কয়লার স্তূপ জমে উঠেছে। প্রায় চালার মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। এত কয়লা। কেন এ তো প্রায় দশ কুড়ি টাকার মতো মাল হবে। চকচক্ করে উঠল মদনের চোখ জোড়া।

বাচ্চা বলল, এগুলি তাদের সঞ্চয়। যখন ছাইগাদায় আর একটিও কয়লা থাকবে না, যখন কনট্রাক্টরের লরি ঘেঁষ ফেলতে যাবে আরও দু-চার মাইল দূরে; তখন তারা এ কয়লা বিক্রি করবে। আর পথে পথে কুড়োবে কাগজ, ভাঙা কাচ, ফেলে-দেওয়া লোহার টুকরো।

মদনের বুকের মধ্যে কল্‌কল্‌ করে আশার জোয়ার। শহরের ধূলিকণা-টুকুও ফেলা যায় না। তার ভাবনা কি। তবু যদি একটা কাজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়। মানে, আরও টাকা পাওয়া যায় কোথাও।

রাত্রে সে খেল এদের সঙ্গে শুকনো রুটি, পেঁয়াজ-কুচো আর লঙ্কা দিয়ে। রুটি খাওয়া মদনের ধাতে সয় না। তবু তৃপ্তি করে খেল সে। পয়সা রোজগার করতে হলে কত কি করতে হয়।

তাছাড়া, এরা তার কাছে এখনো পয়সা চাইল না তো। চাইবে না নাকি। এমনি খাওয়াবে রোজ? কিন্তু পয়সাগুলো সে রাখবে কোথায়? যদি টের পেয়ে যায়, তাহলে তো গেল।

বাতি নিভে গেল। বাতি মানে, একটা লোহার কৌটোর মধ্যে খানিকটা তেল ফেসো। যতক্ষণ জ্বলে, ততক্ষণই লাভ। মদনের পাশ ঘেঁষে শুয়েছে বাচ্চা। দুনি ওর মার কাছ থেকে গড়াতে গড়াতে চলে এসেছে মদনের কাছে। অন্ধকারে মদনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে। যেন সে মদনের স্নেহশীলা মা। বাচ্চা তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'মদন, কাঁদিস্‌নে কিন্তু।'

না, কাঁদবে না মদন। কিন্তু এই বিদ্‌ঘুটে ঘরটার মধ্যে শুয়ে তার ঘুম আসছে না। এর চেয়ে তাদের ঢেঁকি ঘরটাও অনেক ভালো। আর ঘুম আসছে না তার টাকার জন্যে। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে দেয় টাকাটা। হঠাৎ সে বলল, 'আচ্ছা বাচ্চা, যখন তোরা ঘরে থাকিস্‌ না, তখন যদি কেউ ঘরের কয়লা চুরি করে নিয়ে যায়?'

এক মুহূর্ত নিঃশব্দ। তারপর বাচ্চার কঠিন চাপা গর্জন শোনা গেল, 'শালার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব না।'

তুনিও ফুঁসে উঠল, 'সে কুত্তার মাংস কামড়ে খাব।'

শুনে মদনের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

কিন্তু তার পরদিন থেকে খাবারের পয়সা দিতে হল মদনকে। সে দেখল, বাচ্চা, তুনিয়া, সবাই রোজ সব পয়সা তুলে দেয় মায়ের হাতে। মদন দেয় না। না দিয়েও তার অস্বস্তি হয়। প্রাণ ধরে পয়সা সে কেমন করে দেবে! কাকে বিশ্বাস করবে সে।

কিন্তু এরা তাকে সেজন্যে কিছুই বলে না। পয়সা বেশী রোজগারের জন্যে মদন সারাদিন ছল খোঁজে। কিন্তু পারে না বাচ্চা আর তুনির জন্যে। পারে না পুনিয়া আর কালুর জন্যে। তারা আছে সারাদিন তার সঙ্গে সঙ্গে। কিশোর মদন টাকার ভাবনায় কুটিল হয়ে উঠেছে। তার আকাঙ্ক্ষা পাগল করে তুলেছে তাকে।

সে এদের সঙ্গে কয়লা তুলতে তুলতে হঠাৎ পালিয়ে যায়। আর একটা বোরা নিয়ে চলে যায়—ছাই-পাহাড়ের আর এক পিঠে। সেখানে আলাদা কয়লা তোলে সে। বিক্রি করে দিয়ে আসে ভিন্ পাড়ায়। বাচ্চারা কেউ জানতে পারে না।

বাচ্চা জিজ্ঞেস করে, 'কিরে শালা, কোথা ছিলি?'

তুনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, 'লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিলি বুঝি?'

হ্যাঁ, কান্নাই তো পায় মদনের। এখনো আর এক ঝুড়িও পুরে ওঠেনি তার। সে যত সহজ ভেবেছিল, তত সহজ তো নয়। কিন্তু তার চাই। দিবানিশি তাকে গাঁয়ের হাঠ-মাঠ ডাক দিয়ে ফিরছে। শহরের ধুলো-মুঠি থেকে সোনা খুঁজতে এসেছে সে।

কিন্তু এবার পয়সা হচ্ছে তার। লুকনো রোজগারের সবটাই জমছে।

অবস্থাই মদনকে চতুর করে তুলছে আরও। সে দিব্যি মিছে কথা বলে দেয়, 'বসেছিলাম। শরীরটা খারাপ। জানিস্, আমি বমি করেছি।'

বমি! হ্যাঁ, এক একদিন এক একরকম বলে সে। আর তার এই চার কিশোর-কিশোরী বন্ধু ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু পুনিয়া সারাদিনই বারে বারে তেতো জলের মতো বমি করে। সে বলে, 'আরে, বমি তো আমিও করি।'

ছুনি অমনি পাকা গিন্নীটির মতো ধমকে ওঠে, 'তোর তো কতকাল ধরেই হয়। ওর তো নতুন। গাঁয়ের ছেলে, মরে যায় যদি!'

বাচ্চা সেটা অনুমোদন করে। সত্যি, মরে যায় যদি। তাছাড়া মদন তাদের অতিথি বন্ধু।

কিন্তু এদিকে মদনের মাল তোলায় কম পড়ে। পড়লেও সেটা পুষিয়ে দেয় তার চার বন্ধু। পুষিয়ে দেয়, তাছাড়া নিজেরা আরও বেশী খেটে ভর্তি করে দেয় মদনের বোরা।

আঙুলের কর গুনে হিসেব করে মদন। তাহলে এখন তার দেড়া লাভ। খাওয়ার পয়সাটা ছাড়া সবটাই বাঁচে। আর এক কুড়ি পুরেছে। আর এক কুড়ি পুরতে চলেছে।

মদনকে এখন আর চেনা যায় না গাঁয়ের ছেলে বলে। তবু তার চোখে অবিশ্বাস্যরকম আলোর ঝলকানি। একটুও টসেনি তার শরীর। মনের গোপন ফুর্তি ও আনন্দ একটা দৃঢ় খুঁটির মতো খাড়া করে রেখেছে তাকে।

মাঝে মাঝে ওরা অভ্যাসবশে জুয়া খেলে জিতলে পয়সাটা মদনকে দেয়। হারলে তো কথাই নেই। কিন্তু মদনকে তারা খেলতে দেয় না। সেদিক দিয়ে বাচ্চার নজর কড়া।

কোন-কোনদিন রাত্রে ওরা বেরিয়ে পড়ে সবাই দল বেঁধে। সারা শহর ঘুমিয়ে পড়লে ওরা দেয়াল থেকে সিনেমার পোস্টারগুলো ছিঁড়তে আরম্ভ করে। টের পেলে পুলিস ঠ্যাঙাবে।

কারো কাঁধে উঠে ডুনি যখন ফ্যাস ফ্যাস করে পোস্টার ছেঁড়ে, মদন তখন দূরের কোন অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ভয়ে ধুক্‌পুক্‌ করে তার। ওরে বাপ্‌রে, যদি পুলিস এসে পড়ে।

আস্তো পোস্টার ছ-আনা সের। ছেঁড়াগুলোর দাম কম। এ পয়সাটাও বেশীর ভাগ দিন মদন পায়। পুনিয়া আর কালু ক্ষুণ্ণ হয় মাঝে মাঝে! কিন্তু বাচ্চা আর ডুনির জন্যে কিছু বলতে পারে না।

মদনের লোভ দিন-দিন উগ্র হয়ে ওঠে আরও। লোভ তাকে বিশ্বাস ও ভালবাসা ভুলিয়ে দেয়। ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। কাজ পাওয়ার আশা তাকে ছাড়তে হয়েছে। নতুন কোন পন্থা না ধরলে আর চলে না। প্রায়ই এদিক ওদিক চুরির কথা শোনা যায়। মদনের চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে, আপশোস্‌ হয়। ইস্‌! যদি সে নিজে ওরকম করতে পারত! কিন্তু বাচ্চারা কোন সময়েই সেরকম কিছু করতে চায় না!

গঙ্গার ধারে ঘেঁষ-গাদায় কয়লা ফুরিয়ে আসছে। বসন্তকাল এসে পড়েছে। তার ঘূর্ণি হাওয়ায় শুধু ছাই ওড়ে এখন গঙ্গার ধারে। সবাই কন্‌ট্রাক্টরের লরির পেছনে ছুটছে। যত দূরই হোক। মদনরাও যায়। কিন্তু মদনের নজর পড়েছে এবার ঘরের সঞ্চিত কয়লার দিকে। এবার এই অনায়াসলভ্য লোভ হাতছানি দিল তাকে।

মনে পড়ে বাচ্চার গর্জন, ডুনির ফোঁসানি। হ্যাঁ, তারই চোখের সামনে যখন সদা বোষ্টম তাদের গাইয়ের দুধ খেত, তরকারি বিক্রি করে টাকা নিত, তখন তারও ইচ্ছে হত ওর গলাটা টিপে দেয়।

তবু নিজেকে সামলাতে পারল না সে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রথমদিন সে চুরি করে ফেলল এক বোরা। তারপরে সহজ হয়ে এল। নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তার মন। যদি তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে, তবুও তার চাই। না হলে যে তার স্বপ্ন ফলবে না। যুগযুগান্ত কার মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে। তবে একটু সামলে, সাবধানে।

এ ঘরে খাওয়া কমে গেছে। বিকালে আর কেউই কিছু খায় না। অসহ্য কষ্ট হয় মদনের। সে ফাঁকতালে লুকিয়ে দু-চার পয়সার কিছু খেয়ে নেয়। কিন্তু খেতে গিয়ে কেন যেন এক একসময় গলায় আটকায় তার। খালি বাচ্চার আর দুনির উপোসী শুকনো মুখটা মনে পড়ে যায়। কিন্তু না খেয়ে যে সে পারে না! ওরা না খেয়েও হাসে, ঝগড়া করে। এমন কি, এ অবস্থাতেও দুটো কি চারটে পয়সা জুয়ার প্লেটেও ঢেলে দেয়। বলে, 'একবার লাক্ টেস্ হয়ে যাক্।'

লাক্ টেস্। ভাগ্য পরীক্ষা। জয় মা কালী! মদনের ভাগ্য ঠিক আছে। শহরের একটা শিব-মন্দিরে গিয়ে মদন সোজা চারটে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে একমুহূর্ত ভাবে। আবার দুটো পয়সা দেয়। দেবতার দয়া পেয়েছে সে। বাচ্চা ওরা একবারও ভগবানকে ডাকে না। কেন? সেইজন্যেই ওদের ভাগ্য ফেরে না। কিন্তু মদন গোপনে গোপনে নিয়ত ডাকছে ভগবানকে। ভাবে, শিব-মন্দিরের পয়সাটা দিয়ে ওদের খাইয়ে দেয়। কিন্তু দেবতা বিরূপ হলে! ওরে বাপরে হ্যাঁ, পেতে হলে দানধ্যানও নাকি করতে হয়। শিব-মন্দির থেকে বেরুবার সময় একটা কি দুটো ফুটো পয়সাও দিয়ে দেয় ভিখিরিকে। দিতে হয়।

রাত্রের খাওয়াও কমে গেছে। আধপেট খেয়ে দুনি শুয়ে থাকে মদনের

পাশ ঘেঁষে। আর একপাশে বাচ্চা। বাচ্চার নিশ্বাস লাগে গায়ে। ঘুমন্ত তুনি তার ছোট্ট মুঠি দিয়ে ধরে রাখে মদনের হাত। অদ্ভুত তুনি। যেন ধরে না রাখলে মদন চলে যাবে। বিমলীর চেয়েও ভালো তুনি। ইচ্ছে করে, তুনিকে সে তার সব কথা বলে দেয়। কিন্তু বাচ্চা! তুনি ঠিক বাচ্চাকে বলে দেবে। বাচ্চাকে তার বড ভয়। বড় ভয়ংকর মনে হয় এক এক সময়। রাগলে ও কি না করতে পারে। বাচ্চা যেন তার বাপের মতো। অথচ তার চেয়েও রোগা, তার চেয়েও চেহারায় খাটো।

কিন্তু সে তো চলে যাবেই। অনেক সয়েছে সে। পীড়ন ও অপমান, ক্ষুধা ও মার। তার শোধ তুলবে। সে জমি কিনবে। সে চাষার ছেলে। জমি না হলে তার কিছুই নেই।

কত জমেছে তার। কত! গোনে সে, এক কুড়ি, দু-কুড়ি, তি—ন, না তিন পুরো হয়নি। তবু এতগুলো টাকা। জীবনে দেখেনি সে। বাপের জন্মে হাতে তোলেনি একসঙ্গে এতগুলো। আর এসব তার নিজের।

কিন্তু আরও চাই। সমস্ত ঘুমন্ত বস্তির মধ্যে সে যেন একটা অশরীরী আত্মার মতো ছটফট করে ওঠে তুনি আর বাচ্চার মাঝখানে। আরো চাই।

ওরা টের পেয়ে গেছে। টের পেয়েছে, কয়লা কমে যাচ্ছে। যেন সেই রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ-ভ্রমরের ডানায় হাত পড়েছে। হাঁই মাঁই কাঁই শত্তুরের গন্ধ পাই। কয়লা কেন কম?

কম? মা, ছোট ছোট শিশু, তুনি, বাচ্চা এমন কি পুনিয়া কালুরও চোখ জ্বলে উঠলো। কিন্তু কে নেবে? কখন নেবে? নিশ্চয়ই বস্তির কেউ নিয়েছে। লাট্টু পাগলা? রামুর নানী বুড়ি? কে?

কিন্তু মদনের কথা তাদের একবারও মনে আসেনি। ভাবতে পারেনি।

তবু মদন ধরা পড়ে গেল। নিঝুম দুপুর। এসময় বস্তিতে একটা কাক পক্ষীরও সাড়া পাওয়া যায় না। মদন কয়লা পুরছে বোরার মধ্যে। ঘরের দরজাটা ভেজানো। মদন সোনা তুলছে। শব্দটাও কী অদ্ভুত। ছোট ছোট কয়লার একটা অদ্ভুত ধাতব শব্দ আছে। বাচ্চা ওরা প্রায় দু-মাইল দূরে গেছে কয়লা তুলতে।

দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। বাচ্চা আর দুনি। দুটো বাচ্চা বাঘ আর বাঘিনী!

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মদন সেঁটে গেল কয়লার গাদায়। ভয় পেয়েছে, তবু আত্মরক্ষার জন্যে চকচক্ করে উঠল তার চোখ।

দুনি আর বাচ্চার মুখে কথা নেই। তারা প্রথমটা বুঝতেই পারল না। একেবারে হতভম্ব হয়ে মদনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাচ্চা বলল, 'তুই?'

মদন অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠল, 'কি? আমি কি?'

এই চিৎকারটা বাচ্চার চোখের সামনে যেন পর্দা খুলে দিল। চোখের নিমেষে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মদনের উপর।—'শালা চোট্টা, জান চুরি করছিস্? কুত্তা, জমি কিনবি?'

মদনের চুলের ঝুঁটি ধরে সে ধপাস করে মাটিতে পড়ল। মদন ককিয়ে উঠল। আশ্চর্য! দুনি দলা দলা থুথু ছিটিয়ে দিতে লাগল মদনের গায়ে মুখে। তার ছাই-ধুলোঘাঁটা মুঠি দিয়ে দুম্ দুম্ করে কষিয়ে দিল ঘুষি, 'শালা, ঘর চৌপাট করবি?'

মদন প্রাণপণে বাচ্চাকে ঠেলে উঠে, কেঁদে চিৎকার করে উঠল। তার চুল ছিঁড়ে গেছে। জামাটাও ফালি ফালি হয়েছে। বাচ্চা চিৎকার

করে উঠল, 'যা শালা, ভাগ্ ভাগ্ এখান থেকে।'

তখনো মদনের হাতে বোরাটা ধরা ছিল। সেটা ফেলে দিয়ে মার-খাওয়া কুকুরের মতো একবার তাকিয়ে দেখল বাচ্চা আর তুনিকে। বাচ্চা আর তুনি। তার দু-পাশে শুয়ে থাকত ওরা। ওদের ঘুমন্ত বুকের ধুক ধুক্ এখনো তার সর্বাঙ্গে বাজছে। কিন্তু তার স্বপ্ন! চোখের জলে ঝাপসা পথটা কাঁপছে। কোমরে ন্যাকড়ার ফালিতে বাঁধা তার সেই টাকা, যখ দেওয়া টাকা, যেন কোমরে সাপের প্যাঁচ দেওয়া রয়েছে। কিন্তু বাচ্চার চোখ দুটো কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, ও এখন খুন করতে পারে।

সে স্টেশনে গিয়ে উঠল, তার পেছনে পেছনে এল ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত বাচ্চা আর তুনি, তারা বিচিত্র কৌতূহলে ও ঘৃণায় মদনকে দেখতে লাগল, যেন একটা কুৎসিত জানোয়ার দেখছে। গাড়ি আসছে, মদন এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের দিকে, কিন্তু মারের চেয়েও একটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে তার বুকটা, তার ছেঁড়া জামা ঢাকা পিঠে বিঁধছে দু-জোড়া চোখের জলন্ত খোঁচা। বাচ্চা আর তুনি, যাদের সে ঠকিয়েছে। যাদের ঘুমন্ত উপোসী বুকের মাঝে সে ভরা পেটে মটকা মেরে পড়ে থেকেছে।

কিন্তু ওদের যদি সে গাঁয়ে পেত, তবে কত কিছু খাওয়াতে পারত।... কিন্তু তার গ্রাম! তাদের গ্রামের দিকে মুখ ফিরে তাকাল সে দূর রেল লাইনের দিকে, সেখানে তো তার সেই মা, সেই সদা বোষ্টম, সেই সংসার, জোয়াল আর বলদ। আর এই ট্যাঁকের অপুরন্ত তিন কুড়ি, এই নিয়ে তার সেই স্বপ্ন-রাজ্য, তার জমি।

গাড়িটা এল আর তার কিশোর বুক ভেঙে একটা অসহ্য কান্নার বেগ ঠেলে এল হু হু করে। বাচ্ছা তুনিদের ঠকানো তার এই কটা টাকা,

আর তার সাধ, তার সবকিছু সদা বোষ্টমের বিদ্রূপভরা হাসি ও নিষ্ঠুর মারে যেন ভেঙে পড়ল। তার অনেক বোঝার পরিণতি নিজেকেই বিস্মিত ভীত হাস্যাস্পদ করে তুলল, এ অবাস্তবতা ও ব্যর্থতা তার মনের সমস্ত কল্পনাকে আচমকা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল। এক মুহূর্তে ধ্বসে গেল তার বালির বাসনা সৌধ, তার অপুরস্ত তিন কুড়ি।

তার বাসনা-সৌধ চূর্ণবিচূর্ণ করে গুম্ গুম্ করে ছেড়ে গেল গাড়িটা, হাওয়ার ঝাপটায় পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগল তার ছেঁড়া জামার ফালি, ঝাঁপিয়ে পড়ল চুলের গোছা, এঞ্জিনের ছেড়ে যাওয়া ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল তার মূর্তিটা আর ছাই-ধুলো মাখা চোখের জলের কালো দাগে ভরে উঠল গালদুটো।

বাচ্চা ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল, 'শালা গেলিনে?'

মদন তার লাল করুণ চোখ-দুটো দিয়ে কোনরকমে একবার ওদের দুজনকে বাঁকিয়ে দেখল, বলল, 'না।'

'না?' খেঁকিয়ে উঠল বাচ্চা।

মদন কোমর থেকে টেনে খুলে ফেলল টাকার থলিটা, ফুলে-ওঠা বাঁকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ভাঙা গলায় খালি বলল, 'আমি যাব না।'

তারপরে টাকার থলিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ওইখানে ঘাড় গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বাচ্চা এক মুহূর্ত চুপ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'শালা উল্লুক কাঁহি কা।'

আবার একটা গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল। চৈত্র-দুপুরটা মেতে উঠল হাওয়ায় হাওয়ায়।

ধুলি মুঠি কাপড়
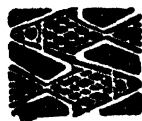
ফাল্গুন মাস। পথ চিনতে হয়নি, বঙ্গোপসাগরের বুকের বাতাস আপনি ছুটে এসেছে শহরের বুকে। দূর বন মাতিয়ে, অনেক ঝরাপাতা ঠোঁটে নিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে এসেছে প্রাসাদপুরীতে। নাম নিয়ে এসেছে নতুন ফুলের, কথা নিয়ে এসেছে নতুন গানের। অনেক ধুলো উড়িয়ে এসেছে ঝকঝকে আকাশের গায়ে। সেই ধুলোর গায়ে রৌদ্রকণা এঁকে দিয়েছে অনেক রঙের রংঝালর। ছাদের আলসেতে, কানিশে, খিলানে, জানলায় বাতাসের ফিসফিসানি কী এক গূঢ় খুশির কথা বলছে চাপা স্বরে।

জামা কাপড় পরতে পরতে পাশের ঘরে গুন্‌গুন্ করছে অমলা। গুন্‌গুন্ করছে ওর সেই প্রিয় গানখানি, 'ওহে সুন্দর, মরি মরি!'

বেরুতে হবে, সময় হয়ে গেছে। এ ঘর থেকে প্রমথ তাড়া দিয়েছে অনেকবার। তাড়া দিয়ে এখন মোহমুগ্ধ শূন্য দৃষ্টিটা মোটা লেন্সের ভেতর থেকে মেলে দিয়ে চুপ করে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমলার গুনগুনানি শুনছে আর ফিস্‌ফিস্ করছে নিজের মনে, 'তোমায় কী দিয়ে বরণ করি, ওহে সুন্দর!' প্রমথর সারা মুখে একটা চাপা খুশির আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। গানটি অমলার প্রিয় নয় শুধু। ওর ধ্যান সঙ্গীত। সাত বছর ধরে ওই গানটি ছাড়া আর বুঝি কোন গানই গায়নি অমলা। সাত বছর আগে, এক সভায় সভাপতি বরণ করেছিল অমলা ওই গানটি গেয়ে। রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি আসরের জ্ঞানীপুরুষ, অন্যদিকে লক্ষ্মীর বরপুত্র সেই সভাপতি। অথচ

নিরহংকারী, আত্মভোলা, প্রশংসাকুণ্ঠিত সুপুরুষ। সেই সভাপতি প্রমথ পুরকায়স্থ। প্রমথ নিজেই।

হঠাৎ দমকা বাতাসে দরজার একটা পাল্লা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। প্রমথ একটু চমকে উঠল। বলল, 'কই, হল তোমার?'

জবাব এল, 'যাচ্ছি গো! বড্ড যে হাওয়া!'

প্রমথ অবাক হয়ে বলল, 'হাওয়া! হাওয়া তো তোমার কি?'

খুশি—চাপাগলায় কপট বিরক্তিভরা চাপা স্বর শোনা গেল, 'বড্ড জ্বালাতন করছে যে!'

হাওয়ার জ্বালাতন? এসব বিষয়ে প্রমথ অমলার তুলনায় একটু অপটু। তাই এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পর মুহূর্তে হেসে উঠল। বলল, 'ভারি বেয়াদপ্ হাওয়া তো? যাব নাকি?'

আর্ত কপট স্বর ভেসে এল, 'আজ্ঞে না মশাই, আসতে হবে না।'

প্রমথ বলল, 'তবে দক্ষিণের জানলাটা দাও না বন্ধ করে।'

খুশির সুরে খানিকটা বিদ্রূপ চলকে উঠল অমলার গলায়, 'বয়ে গেছে। না হয় একটু বেসামাল হয়েই বেরুব।'

বলতে বলতেই বেরিয়ে এল সে। এক ঝলক আলোর মতো। সন্ধ্যার ঘোরে একরাশ সন্ধ্যাকলির মতো। সাজেনি, সাজেও না সে কোনদিন। কিন্তু অমলার রূপই অপরূপ। না সেজেও অনেক সাজে ভরা, সেটুকু আছে তার ষোল আনা। অল্প দামের একখানি মাধবী রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে। চুল বেঁধেছে এলো করে। নিরলংকার হাতে শুধু ছোট্ট একটি সোনার হাতঘড়ি। কানে দুটি ফুল। একহারা ছিপছিপে বলা যেত অমলাকে। হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু ঈষৎ নম্রতা ও গুটি কয়েক বলিষ্ঠ ঢেউ তাকে ভারি ও ভরাট করে তুলেছে।

পাশে দাঁড়িয়ে প্রমথ। একটু মেদবহুল। সেটুকু তার দীর্ঘ দেহে

মানিয়ে গেছে। মাজা মাজা রঙের উপরে তার সারাদেহ ঘিরে একটা সতর্ক বুদ্ধি উঁকি মেরে আছে যেন। চোখ দুটি একটু বেশী দীপ্ত, তীব্র, অনুসন্ধিৎসু। হাসলেও তার মুখের একটা বিচিত্র আড়ষ্টতা কখনো দূর হয় না। সেজন্যে তাকে ভাবুক বলে মনে হয় সবসময়।

বলল, 'কই, বেসামাল দেখছি না তো ?'

সামনে এসে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল অমলা। আড় চোখে তাকিয়ে একটু বিচিত্র হেসে বলল, 'দেখতে পাচ্ছো না, সে বুঝি আমার দোষ ?'

মোটা লেন্সের আড়ালে প্রমথর চোখ দুটি আরও দীপ্ত হয়ে উঠল। কাছ ঘেঁষে বলল, 'মনে মনে হয়েছ বুঝি ?'

'ভাগ্ !' বলে একটু নিঃশব্দে হাসল অমলা। সর সর্ করে এক ঝলক হাওয়া ঢুকল ঘরে। বলল, 'চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

প্রমথ যেন চমকে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ চল। একটা কথা, মজা দেখেছ ? ফাল্গুন মাস পড়েছে, কর্পোরেশনের এখনো ঘুম ভাঙেনি। পক্স হয়ে দু-চারটি মরলে, তারপর তারা ভ্যাকসিনেশন অভিযান শুরু করবে। তুমি ওটা একটু নোট্ করে নাও। পিতৃমাতৃহীন শিশু সংঘে যেন আগামীকালই সব ছেলেকে ভ্যাকসিনেট্ করা হয়, সেটা বলতে হবে। ভুলে না যাই।'

এই খুশির গোধূলি-মুখে শ্রদ্ধার হাল্কা গাম্ভীর্য নেমে এল। প্রমথর দিকে এক মুহূর্ত বিস্মিত প্রশংসায় তাকিয়ে থেকে অমলা বলল, 'সত্যি, কী সজাগ মন তোমার। মন তোমার ওই সংঘের ছেলেদের কাছেই পড়েছিল দেখছি।'

নোটবুকে টুকে নিয়ে নীচে নেমে এল তারা। মস্ত বড় বাড়ি। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশাল প্রমোদভবন। আজকে নিঃশব্দ এক

জনহীন রাজপুরী। নীচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে। ছুটি চাকর। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। বাগানটি একসময়ে হয়তো খুবই ভালো ছিল। এখনো ফুল আছে। অনেক টব আছে। পাম আর সুপারী দুলছে হাওয়ায়। কলমের আম লিচু ঘিরে আছে চারদিক থেকে। তবু যেন কেমন শ্রীহীন। ওদিকে বিশেষ নজর নেই প্রমথর।

গেট খুলে বেরুতে যাবে এমন সময় একটি ছেলে নমস্কার করে এসে দাঁড়াল। অপরিচিত। একটি চিঠি প্রমথর হাতে দিয়ে বলল, 'কুঞ্জদা পাঠিয়েছেন।'

প্রমথ চিঠি খুলল। নমস্য কুঞ্জদা। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতা। লিখেছেন, "সর্বেশ্বরকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? সে পাকিস্তানের জেলে রয়েছে এও জানো। তার স্ত্রী তার দুটি বাচ্চা নিয়ে এখানে এসেছেন। দায়িত্বটা আমার। তোমার আর অমলার আশ্রয়ে উনি আপাতত মাসখানেক থাকুন, এই আমার ইচ্ছে। তোমাদের মতামত জানাবে। সেই বুঝে কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, "নিপীড়িত মা ও শিশুদের নিয়ে তোমার বক্তৃতা-গুলি আমি সব শুনেছি, শুনছি। মায়েদের প্রতি তোমার এই অগাধ শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি তোমার চওড়া শীতল বুকখানির স্নেহাশ্রয় স্মরণ রেখে নারীরা তোমাকে চিরদিন আশীর্বাদ করবেন, ছেলেরা তোমায় মাথায় করে রাখবে চিরদিন। ধন্য ভাই! সত্যি বলতে কি, সর্বেশ্বরের স্ত্রীপুত্রকে দেখে কেন যেন তোমার কথাই মনে হল আমার।"

গৌরবের আনন্দে এবং কুণ্ঠায় লজ্জিত হয়ে উঠল প্রমথ। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল অমলার হাতে। অমলা পড়ল। শেষের কথাগুলি পড়তে পড়তে প্রমথর দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকাল সে। পড়া হয়ে

গেলে দু-চোখ ভরে আবার দেখল সে প্রমথকে। বোধ হয় তার সেই প্রিয় গানটি গুঞ্জরিত হচ্ছিল মনের মধ্যে।

প্রমথ বলল, 'বল।'

অমলা বলল, 'বলব আবার কি। কুঞ্জদা লিখেছেন যখন, নিশ্চয় আসবেন।'

প্রমথ বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।' ছেলেটির দিকে ফিরে বলল, 'পাঠিয়ে দিতে বলবেন। কুঞ্জদাকে বলবেন, বেরুবার মুখে চিঠি লিখে জবাব দিতে পারলাম না।'

ছেলেটি নমস্কার করে চলে গেল।

সভায় যাওয়ার মুখে কুঞ্জদার চিঠিখানি তাকে যেন নতুন করে সম্বর্ধনা জানাল। অমলা জিজ্ঞেস করল, 'সর্বেশ্বরবাবু কে? কখনো শুনিনি তো?'

প্রমথ বলল, 'বলছি, গলিটা পার হয়ে নিই।'

গলিটা পার হওয়া সত্যি এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা যখন হেঁটে পার হয় গলিটা, তখন চারদিক থেকে এসে পড়ে অনেক উঁকি-ঝুঁকি। অনেক ফিসফিসানি গুঞ্জন করে দরজায় জানলায়। ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নয়। সকলের কৌতূহল ছিল অনেকখানি, বিস্মিত শ্রদ্ধা ছিল তার চেয়ে বেশী। এ দম্পতিটির প্রেম নিয়ে, কার্যকলাপ ও আদর্শ নিয়ে রীতিমত আলোচনা হয় পাড়ার মধ্যে। ওদের কেউ কোনদিন আলাদা, একলা বেরুতে দেখেনি। বেরোয় না ওরা। তার জন্যে কেউ কোন মন্তব্য করে না। বরং সকলেই বেশ খুশি আর শ্রদ্ধা পোষণ করে। পাড়ার রকবাজ ছেলে-বুড়োরাও চুপ করে যায় ওদের দেখলে। যাদের মন্তব্য শোনা থেকে কেউ নিস্তার পায় না। একলা একটা মেয়ে তো দূরের কথা, কোন দম্পতিও নয়। ওরাও চুপ করে

থাকে। আড়ালে বলাবলি করে, 'শালা একেই বলে বড়লোক।'
'মাইরি! লোকে যারে বড় বলে...'
'হ্যাঁ, জোড়া যদি বাঁধতে হয় তো, এই রকম।'
'এদিকে খুব টাকা! কিন্তু বোঝা যায়?'
মেয়েরাও নানা রকম বলে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বৈ কি।
প্রমথ গায়ে মাখে না। মাখলেও বুঝতে দেয় না। অমলার বড় লজ্জা করে। নতুন বিবাহিতার মতো সলজ্জ চাপা হাসি কাঁপতে থাকে ঠোঁটের কোণে। কুমারী মেয়ের মতো লোকচোখের আড়ষ্টতা জড়িয়ে ধরে ওর সর্বাঙ্গে। কোন কোন মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে তার আলাপ আছে। তাদের দিকেও সে তাকাতে পারে না চোখ তুলে। স্বামীর সঙ্গে যাওয়ায় লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেনি আজো। পাড়াতে নয়, সভাতেও। তবুও ঘরে বাইরে তারা এক সঙ্গে। অথচ চার বছর কলেজে পড়া মেয়ে। "ওহে সুন্দর, মরি মরি!' গেয়ে সে একদিন মরেছিল। কিন্তু সেই কুমারী মেয়েটি ছায়ার মতো ফিরছে তার পিছে পিছে। তার এই সাতাশ বছরের সাত বছর ধরে। তার রক্তকোষের রঙের মালায় সে যেন আজো বাঁধা পড়ে আছে।
বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারা। ফাল্গুনের সন্ধ্যায় ভিড়বহুল রাস্তা। গাড়িগুলিতে এখনো আপিস ফেরতাদের ভিড়। ভ্রমণবিলাসীদের ভিড় পথে ও স্টপেজে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে এখন একটি একটি করে। মোড়ে ঝাঁপিয়ে পডছে দিশেহারা বাতাস।
অমলা বলল, 'বললে না সর্বেশ্বরের কথা?'
প্রমথ বলল, 'তবে চল হেঁটেই যাই।' তারপরে বলল অনেক কথা। সর্বেশ্বরের কথা।
বলল, 'কলেজে পড়ি তখন। সতেরো বছর বয়স। সর্বেশ্বরও পড়ে।

সে আমাকে রাজনীতিতে দীক্ষা দিল। টেনে নিয়ে গেল একটা গুপ্ত দলে। আমাদের বাড়ির আবহাওয়া চিরকালই খুব খারাপ, তোমাকে বলেছি। একটা জঘন্যতম ফিউডাল পাপের বাসা ছিল বাড়িটা। বাবা সারাদিন বাড়ি থাকতেন, বাইরে থাকতেন সারারাত। মা সারাদিন মামাদের বাড়ি থাকতেন, রাত্রে ফিরে আসতেন মামাদের সঙ্গে। মামাদের তু-একজন বন্ধুও থাকতেন সঙ্গে। সকলে মিলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত চালাতেন গল্প, তাস খেলা। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এঁরা আবার সমাজে ছিলেন খুব গণ্য-মান্য। এর মাঝে আমি! আমার ছিল পড়া, খাওয়া, স্কুলে যাওয়া, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বেড়ানো, আর সমস্ত বাড়িটার উপর একটা অন্ধ বিদ্বেষ নিয়ে ভূতের মতো ঘোরা। তার থেকে আমাকে মুক্তি দিল সর্বেশ্বর। তারপর সর্বেশ্বরের সঙ্গে জেল খেটেছি বছর খানেক। জেল থেকে বেরিয়ে বারো বছর একসঙ্গে ছিলাম আমরা। রাজনীতি আর পড়া, তুটোই চলেছিল একসঙ্গে। বাড়িতে বাবা মা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তাঁরা আর সময় করে উঠতে পারেননি, এত ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের নিয়ে। এক বছরের মধ্যে মারা গেলেন তুজনেই।···বারো বছর পর সর্বেশ্বর চলে গেল ঢাকায়। বাড়ি ওর ওইদিকেই, রাজনীতির ক্ষেত্র হিসাবে ওইটাই বেছে নিল ও। সর্বেশ্বর চলে যেতে আমাকেও কাজের ক্ষেত্র পাল্‌টাতে হল। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। দল ভেঙে গিয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু নতুন অনেক দল হয়েছিল। বিশেষ কোন দলে যাইনি আর। তবু কাজ করে চলেছি। আর···'

প্রমথ থামল। অমলা তাকাল সপ্রশ্ন ব্যথিত চোখে। ব্যথা তার প্রমথর জীবন সংগ্রামের কথা ভেবে। বলল, 'আর?'

প্রমথ হঠাৎ অমলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'পেলাম তোমাকে।'

বাতাসে আঁচল উড়ছে অমলার। চুল এলো হয়ে পড়েছে আরও। ফাল্গুনের রাস্তায় রাস্তায় ঘরবিমুখ মানুষের ভিড়।

অমলা বলল, 'অতি তুচ্ছ ঘটনা।'

'না, সব চেয়ে বড় ঘটনা। আর কিছু চাইনে, তোমাকে ছাড়া।' গলার স্বরটা কেমন গোঙানির মতো শোনায় প্রমথর। চোয়াল ও চিবুকের মাংসপেশী কাঁপতে থাকে থরথর করে। কেমন অস্বাভাবিক আর উদ্দীপ্ত দৃষ্টি হয়ে ওঠে তার। ওই কথাটা এমনি করেই বলে সে। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। কেন?

কেমন যেন লাগে অমলার। একটা চাপা কষ্ট হতে থাকে তার বুকে। আর এত ভালবেসে মরা বুকে নিজের অজান্তে একটি দরজা খোলে। খুব ছোট্ট দরজা। সে দরজাটা যেন প্রতিদিনের, প্রতি পলের ভালবাসা দিয়ে তৈরি রুদ্ধশ্বাস বেড়া থেকে একটু মুক্তি চায়। একটু একটু-ক্ষণের জন্যে। তার ভালবাসার সুখটুকু আকাশ ভরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে!

পর মুহূর্তেই আবার তা হারিয়ে যায়। কথা বলে তাড়াতাড়ি। নইলে কষ্টটা ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। বলে, 'মিছে কথা তোমার। আমাকে ছাড়াও তুমি কত কি চাও।'

চমকে ওঠে প্রমথ। চমকায় সে একটু বেশী। তারপর হেসে ওঠে। তেমনি আড়ষ্ট হাসি। বলে, 'অ্যাঁ?—হ্যাঁ—তা...'

খুশি হয়ে ওঠে অমলা। খুশি হয়, এইটুকু চায় সে। প্রমথর তাকে ছাড়া আরও কিছু চাওয়া আর এমনি করে বলা। এটুকু যেন তারই প্রেমের জয়গান।

পরদিন বেলা প্রায় ন-টা। পড়ার ঘরে কাগজ পড়ছিল দুজনেই

অমলা আর প্রমথ। চা পর্ব শেষ হয়েছে। চাকর এসে সংবাদ দিল, নীচে একটি মহিলা এসেছেন। সঙ্গে দুটি বাচ্চা।

অমলা উঠল। তাড়াতাড়ি কাপড়টি একটু গোছ করে নীচে নেমে গেল। প্রমথও এল পিছনে পিছনে।

সিঁড়ির নীচেই অতি সাধারণ একটি মেয়ে। একহারা শ্যামাঙ্গী, মাথায় অল্প ঘোমটা দেওয়া। চোখগুলি বড় বড়। ঠোঁট দুটি অল্প ফোলা। হাসিটি ভারি মিষ্টি। মিষ্টি ও ব্যথিত। কোলের ছেলেটি মায়ের মতোই, কিন্তু বলিষ্ঠ। ঘাড় কাত করে তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে আছে অমলা আর প্রমথর দিকে, আর পা দোলাচ্ছে। কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। মেয়েটি ফর্সা, মাথাভর্তি চুল। চোখ দুটি শান্ত। সব মিলিয়ে দৃশ্যটি বড় করুণ।

অমলা কাছে এসে বলল, 'আসুন। উপরে চলুন। কে নিয়ে এল।'

সর্বেশ্বরের স্ত্রী বলল, 'একটি ছেলে। পৌঁছে দিয়েই চলে গেল।'

'ও!' অমলা প্রমথর দিকে চেয়ে একটু হাসল। প্রমথ তার মোটা লেন্সের আড়ালে ডুবে যাওয়া চোখ দুটো নিয়ে যেন কোন্ শূন্যে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ভাবছিল সর্বেশ্বরের কথা।

অমলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কি ভাই, বলুন।'

সলজ্জ হেসে বলল সর্বেশ্বরের স্ত্রী, 'আরতি।'

'আরতিদি!' বলে অমলা হেসে উঠল। উভয়পক্ষেরই পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবল অমলা হেসে বলল, 'ইনি আপনার স্বামীর বন্ধু।' বলে প্রমথকে দেখিয়ে আবার একবার হেসে উঠে বলল, 'আগে আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত করি। উপরে চলুন।'

আরতি বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু আমার সব সময় নীচে থাকতে পারলে ভালো হয়।'

অমলা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

সস্নেহ গলায় একটু কপট ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'এই যে ছেলে, ভয়ংকর শান্ত কি না। কখন পড়ে গিয়ে হাত-পাগুলি ভেঙে-চুরে ঠিক করে রাখবেন, তার ঠিক কি।'

ছেলেটির পা দোলানি একটু বাড়ল। আড়চোখে তাকাল অমলার দিকে। হেসে ফেলল অমলা। প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে?'

প্রমথ বলল, 'ওঁর যেরকম সুবিধে হয়······'

দু-এক কথার পর নীচে থাকাই সাব্যস্ত হল। প্রমথ অমলার উপর সব ভার দিয়ে উঠে গেল উপরে। আরতিকে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দক্ষিণমুখো ঘরে গিয়ে ঢুকল অমলা। খোকা ততক্ষণে কোলের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে নামার জন্যে।

আরতি বলিল, 'আপনাদের কথা অনেকবার শুনেছি ওঁর মুখে।'

ওঁর অর্থাৎ সর্বেশ্বরের মুখে। লজ্জিত হল অমলা। এদের কথা মাত্র কাল বলেছে তাকে প্রমথ। সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন সর্বেশ্বরবাবু?'

আরতি বলল, 'দু-মাস আগে দেখেছি। নানানখানায় ভুগছে। ওখানে কেউ দেখবার নেই, তাই চলে আসতে বললে। কষ্ট দেব আপনাদের!'

একটু ম্লান হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল আরতি। বলল, 'আপনাদের কথা কুঞ্জদার মুখেও শুনছিলাম। বলছিলেন, ওদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অফুরন্ত, কিন্তু কেমন বড়লোক একবার দেখে এসো। আপনাদের দুজনেরই গুণগানে কুঞ্জদা একেবারে পঞ্চমুখ।'

বলে সে অমলার চোখে চোখে তাকাল। মুগ্ধদৃষ্টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেড়াল অমলার সর্বাঙ্গে। বলল, 'সত্যি আপনি কী সুন্দর!'

একটু রঙের ছোপ লেগে গেল অমলার মুখে। পরমুহূর্তেই আরতি চকিত চোখে অমলার আপাদমস্তক দেখে, কাছ ঘেঁষে বলে উঠল, 'একটা কথা ভাই কিছুই জানিনে, তাই জিজ্ঞেস করে নিই। ছেলেপুলে আছে তো?'

রঙের ছোপ পেরিয়ে, চকিতে কি একটা চলকে যেন ছড়িয়ে পড়ল অমলার মুখে। মুখ থেকে কল্‌কল্‌ করে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরের রন্ধ্রে. রন্ধ্রে। ভারি হয়ে উঠল চোখের পাতা। কোন রকমে, নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

না? যেন এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কিছু নেই। তার সহজ জীবন-যাত্রার এই বিস্ময়টুকুই রীতি। কয়েক মুহূর্ত অবাক থেকে বলল, 'সাত বছরেও নয়। কেন ভাই? এই বিশাল পুরীতে, লক্ষ্মীর এ অফুরন্ত ভাণ্ডারে— ?'

বুকের মধ্যে যেন খিল ধরে গেল অমলার। কেন কেন করে, 'কেন' কাঁটায় কণ্টকিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। এক অভূতপূর্ব লজ্জায় ও অস্বস্তিতে আরতির দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারল না সে আর। কোন রকমে 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে থমকে দাঁড়াল।

একি কথা! কী যে কথা! ওমনি করে তার দিকে চেয়ে এমনি করে কোন মেয়ে তো তাকে কোনদিন বলেনি! সাত বছর, বিশাল-পুরীতে, লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডারে…। কেন? কেন, অমলা তার কি জানে? কোনদিন কি মনে হয়েছে? কোনদিন, কোন কারণে! কি জানি! কোনদিন, কিভাবে, কেমন করে, মনে এসেছে কি না সে জানে না।

একটা তীব্র খুশির লজ্জায় বিচিত্র ছিছিঃকার বেজে উঠল তারে

তারে। তারি মধ্যে একটা কষেবাঁধা সরু তার বেজে উঠল টং টং করে। কী একটা যেন ছুটে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে। নিজের নিটোল হাত দুটি তুলে এক মুহূর্তে দেখে ঢুকে গেল প্রমথর ঘরে। প্রমথই জানে সব।

প্রমথ মুখ তুলে তাকাতেই হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল অমলা। আশ্চর্য! কী লজ্জা যে করছে! স্বপ্নোথিতের মতো জিজ্ঞেস করল প্রমথ 'কি হয়েছে?'

সারা মুখে রক্ত ছুটে এল নতুন করে। তাকিয়ে হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল নিঃশব্দে। আলমারির কাচ ঘষতে লাগল ফিরে।

প্রমথর উদ্দীপ্ত চোখের মণি দুটো যেন ডবল হয়ে আটকে রইল লেন্সের গায়ে। মুখের কয়েকটা রেখা কেঁপে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। যেন হাসছিল সংশয়ের হাসি। সাত বছরের প্রথম বছরে এক রহস্য উন্মোচনে এমনি করে হেসেছিল অমলা। কাছে এসে বলল, 'কি হয়েছে অমলা?'

অমলা প্রমথর মস্ত হাতখানি তুলে ঢেকে দিল নিজের মুখ। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কী যে বলেন আরতিদি।'

যেন ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল প্রমথ, 'কি বলেন?'

চকিত কটাক্ষে এক বিচিত্র ঝিলিক দিয়ে বলল অমলা, 'জানিনে যাও।'

বলেই হেসে আবার লঘুপায়ে চলে গেল দরজার কাছে, 'আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি উপরে চা খেতে।'

ঘুরে আবার তর্‌তর্ করে নেমে গেল নীচে। স্তব্ধ প্রমথ আধো-অন্ধকার লাইব্রেরী ঘরে মস্ত একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে কুঁচকে উঠল ভ্রূজোড়া।

অমলা নীচে গিয়ে চাকরকে বলল, উপরের শোবার ঘরে সবাইকে চা দিতে। আরতির ঘরে ঢুকল মাথা নীচু করে। তাড়াতাড়ি খুকীর হাত ধরে বলল, 'উপরে চলুন, আগে চা খেয়ে নেবেন।'

অস্বস্তি হচ্ছিল আরতির। কি একটা অপরাধের কুণ্ঠাবোধ এসেছে তার মনে। অমলার এড়িয়ে যাওয়াটুকু চোখ এড়াল না তার।

চায়ের আসরে কথা হল সর্বেশ্বরের, পাকিস্তানের অবস্থার। তারপরে স্নান-খাওয়া। গোছানো হয়েছে নীচের ঘর। যতটা সম্ভব বাসযোগ্য করে বিছানা পাতা হয়েছে।

সারাটা দিন বাড়ির বাগানে ঝিরিঝিরি শব্দে হাওয়া বইল। প্রমথ দেখল, এক বিচিত্রময়ীরূপে অমলা তার কাছ দিয়ে বার বার হেসে হেসে গেল। আরতি দেখল তার এড়িয়ে যাওয়া। আর অমলা রাশীকৃত লজেন্স বিস্কুট করল জড়ো। তা দেখে খুকী পেল লজ্জা। আর খোকা বলল, 'টুমি খুব ছুণ্ডল আল্ ভালো।...'

বিকেলে প্রমথ আর অমলা গেল নিখিল বঙ্গ মাতৃ ও শিশু সংঘের আপিসে। একজন সেক্রেটারী, অন্যজন কার্যকরী সমিতির সভ্যা।

পরদিন চায়ের পাট শেষ করে যখন আরতির সঙ্গে নীচে নেমে এল অমলা, তখন আরতি বলল, 'কালকে আমার উপর খুব রাগ হয়েছে না?'

ভারি সুন্দর আর করুণ হয়ে ওঠে আরতির চোখ দুটো। সারাটি দিন কালকে আরতির দিকে চোখ তুলতে পারেনি অমলা। কুমারীর মতো এক নতুন লজ্জা বেড়াচ্ছিল লুকিয়ে। আজো তাই লজ্জায় লজ্জায় এসেছিল। অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

আরতি বলল, 'জানতুম না, তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম। কেমন ভারি আর সুন্দর চেহারাটি তাই। নষ্ট-টষ্ট হয়ে গেছে বুঝি?'

আবার সেই কথা। লাল হয়ে উঠল অমলার মুখ। উষ্ণ তরঙ্গ কিলবিল করে এল কানের কাছে। এ কথায় বাধা দিকে চাইল একবার। পারল না। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

বুঝি চকিতে একটা কালো ছায়া ঘুরে গিয়েছিল অমলার মুখের উপর দিয়ে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরতি বলল, 'একেবারেই নয়, না? বুঝেছি। তাই হয়। যেখানে অনেক আছে, সেখানে বুক খালি। যেখানে অনেক খালি, সেখানে বুক ভরা।' বলে একটু হেসে নিজের ছেলেমেয়েকে সস্নেহ ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন না। বুক ভরে পেয়েছি, রাখতে পারব কি না জানিনে।' আবার বলল, 'প্রমথবাবুর কষ্টও কম নয়।'

মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল অমলা। আরতির কথার অন্তর্নিহিত অর্থ অমলা বন্ধ্যা। বন্ধ্যা! অদৃশ্য বিষধরের চকিত দংশনের মতো একটা তীব্র ব্যথা ধরে গেল বুকে। মনের মধ্যে নিঃশব্দে গুমরে উঠল, না না না। তবু মুখভাব অবিকৃত রেখে বলল, 'রান্নার কথা বলে আসি।'

বলে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। প্রমথর ঘরের দিকে বাঁক নিতে গিয়ে ছুটে গেল শোবার ঘরে। বিছানায় পড়ে হাঁপাতে লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল মুখে। এলো খোঁপা গেল খুলে। গলার কাছে যেন কি একটা ঠেলে আসতে লাগল।

একটু পরে এলোমেলো বেশে এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। যেন কোনদিন দেখেনি এর আগে। দেখতে দেখতে একবার আঁচল খসালো, আবার জড়ালো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজের সর্বাঙ্গ। আর ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল, আছে, আছে অনেক আছে। দেখে দেখে হাসল, ঠোঁট কামড়াল।

কিন্তু সেই বিষ দংশনের জ্বালাটা ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল কেবলি। দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল রক্তকোষের মধ্যে।

কী আর এমন কথা! তবু কী যে কথা! তার জীবনের বাঁধা বীণার তারগুলি সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে কুঁকড়ে গেল যেন। তার অনেক রং সাতরঙা মুখে যেন ছিটিয়ে দিয়েছে কালি। তার নারীত্বকে করুণা করেছে আরতিদি। ধনে মানে অনেক আছে, তবু বুক খালি। সাত বছর নষ্ট হয়নি। তবে? তার সব শূন্য। তার শূন্যতায় প্রমথর কষ্ট।

বিস্মিত ভয়ে তাকাল আবার আয়নার বুকে। তাকিয়ে চোখ বুজে হাসল। আবার চোখ খুলে হেসে উঠল ছোট্ট মেয়েটির মতো। চোখ ঘুরিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ইস্! নেই যেন!' তবু জ্বালাটা তো জুড়োতে চায় না।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল প্রমথর ঘরে। নিঃশব্দে কিন্তু আশ্চর্য! প্রমথ যেন হাওয়ায় টের পেল। টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকাল যেন ঘুমভাঙা চোখে।

খোলা চুল, এলানো বেশ অমলার। টিপে টিপে হাসছে অন্যদিকে চেয়ে। আবার লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরছে। নতুন বেশ, নতুন রকম। সাত বছরের চেয়ে বিচিত্রতর।

দিবানিশি কাজ ও চিন্তার গৌরবে আঁকা প্রমথর মুখের রেখাগুলি কেঁপে গেল বারকয়েক। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

ভ্রূ কাঁপিয়ে ফিরে তাকাল অমলা। আচমকা অভিমান স্ফুরিত ঠোঁটে, বিদ্যুৎ কটাক্ষে বিঁধিয়ে দিল প্রমথকে। আবার কোন কথা না বলে ফিরিয়ে নিল মুখ। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। প্রমথ ডাকল। ফিরল অমলা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে প্রমথ। চিন্তার বাষ্পে ঢেকে

গেছে প্রায় মুখটা। সিরিয়াস্ হয়ে উঠেছে। যেন ধরাই পড়ল না আর অমলার এ বিচিত্রতর রূপ। একখানি কাগজ বাড়িয়ে বলল, 'সুইডেন থেকে চিঠি এসেছে, মার্চে ওদের মাতৃসংঘের মহাসম্মেলন। তুমি একটা অভিনন্দনপত্র খস্‌ড়া করে ফেল, পাঠিয়ে দেব আজকের ডাকেই।'

খচ্ করে লাগল অমলার বুকে। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না প্রমথ। তার নীরব জিজ্ঞাসা ও চাউনিতে আর কোন কৌতূহল নেই প্রমথর। কোন কৌতূহল, কোন কথা, একটু হাত ধরা? এ কি অবজ্ঞা, না অবুঝপনা! খচ্ করে লাগল, টন্‌টন্ করে উঠল বুকের মধ্যে। কিছু সে বলত প্রমথর কাছে, তার গায়ে গায়ে লেপ্‌টে, ফিস্‌ফিস্ করে। কিন্তু মাতৃসংঘের কাজে কী অদ্ভুত বিভোর সে!

কাগজটা নিল সে হাত বাড়িয়ে। প্রমথর নির্দেশ সে অমান্য করবে, তেমন মন নয় তার। তেমন হৃদয় নয়। সে যে প্রমথ, তার সব শূন্যতাকে ভরে দেওয়ার মালিক।

তবু সাত বছরে, আজকের সবটাই নতুন। তার এমনি করে আসা। প্রমথর এমনি করে নির্বিকারে কাজ তুলে দেওয়া।

দুর্জয় অভিমানের বিদ্যুৎ কটাক্ষে প্রমথর দিকে তাকিয়ে কাগজ নিয়ে বসল সে। কাজ করতে করতে বারবার চোখ তুলে দেখল কাজে ডুবে যাওয়া প্রমথকে। আর চিঠি লিখল সুইডেনের মাতৃসংঘকে। অভিনন্দন জানাল শিশু সংঘের সম্মেলনকে। গুন্‌গুন্ করে উঠল আপন-মনে। 'ওহে সুন্দর মরি মরি!'……সেই ধ্যান-সঙ্গীত।

বাতাস দুর্জয় হয়ে উঠতে লাগল। এতদিনের ঝিরিঝিরি বাতাসে একটা পাগলামির লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। অনাদরে পড়ে থাকা বাগানটার লিচু গাছে ফল ধরতে লাগল, বোল ধরতে লাগল

আমগাছে। বাদামগাছটা শূন্য হতে লাগল, আর একদিকে ভরতে লাগল নতুন পাতায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রমোদভবনটি দুলতে লাগল হাওয়ায়।

নীচের ঘরটায় সব সময় কিচির মিচির। মা ছেলেমেয়ের ছোট্ট সংসারটি সব সময় কলরবমুখর। আরতি কখনো উদাস হয়ে পড়ে। তার উদাস প্রাণের অথৈ জলে একলা খোকার দস্যিপনাই অনেকখানি। উদাস সে থাকতে পারে না।

দিন যায়। কাজ চলে ঠিক প্রমথর আর অমলার। কাজ চলে। প্রত্যহ জোড় বেঁধে বেরোয়। কিন্তু আশ্চর্য। সেদিনের ভাবটা আর দূর হল না। প্রমথ শুধু কাজের কথা বলে, অন্য কথা বলে। গানের কথাও বলে, আদর করে, ভালবাসে, অনর্গল ভালবাসা। শুধু একটি কথা বলে না। অমলা তেমনি অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে প্রমথকে। দেখে তার বিশাল শরীরটা আর অন্ধকার মুখটা।

তবু কি একটা কথা, সেই কথাটি তারা কেউ বলে না। সেই কথা, যে কথা বাতাসে বাতাসে তাদের কানে কানে ফিরছে, ছড়িয়ে আছে চোখে মুখে। সেই কথা, যে না বলা কথা তাদের সাত বছরের সুরে বেসুর ধরিয়ে দিয়েছে। আলগা করে দিয়েছে, সরিয়ে দিয়েছে, ঘিরে দিয়েছে রুদ্ধশ্বাস ধোঁয়ার বেষ্টনী দিয়ে।

এত যে বেসামাল হয়ে বেরুল অমলা, কোন সামাল দিতে তো হেসে হেসে আসে না প্রমথ। নয়তো, যদি বা সে দিত দড়াম্ করে সেই দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ করে। এসব কি সেই নিজের অজান্তে খুলে যাওয়া বুকের ছোট্ট দরজাটি। নিরঙ্কুশ রুদ্ধশ্বাস প্রেমের আলিঙ্গন থেকে ছুটে গিয়ে খুশিটুকু ছড়িয়ে দেওয়া আকাশে আকাশে।

নীচে যায় অমলা। কম যায়। দেখা হয় আরতির সঙ্গে, কথাও হয়

অনেক। ছেলেটা তাকে বলে, 'আম্‌লামাছি'। বলে, 'আম্‌লামাছি তোমাল্‌ কোলে ঠাকবো।'

খোকা কোলে ওঠে। বুকে পড়ে ধামসায়। ধামসায়, আরো কিছু চায়। ওর মায়েরটা ছাড়াও। অমলার মনে হয়, তারহীন তান-পুরাটায় বাজে শুধু ঠক্‌ ঠক্‌ করে। সে পালায়, পালিয়ে বেড়ায়।

কখনো নীচে আসতে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির কোণে। শোনে ওদের কথা। কখনো হয়তো আরতি পড়ায়, 'খোকা, বল্‌তো, একে চন্দ্র......'

'একে চণ্ড।'

'দুয়ে পক্ষ।'

'ডুয়ে পথ।' পরমুহূর্তেই খোকার নতুন চৈতন্যোদয় হয়। বলে, 'একে চণ্ড কি মা?'

আরতি বলে, 'একটা চাঁদ, ওই যে আকাশে থাকে।'

খোকা বলে, 'টুই যে বলিছ, ছেই চাঁডটা আমি। আমি টৌ চাঁড।'

'হ্যাঁ, তুমি আমার চাঁদ।'

'আল্‌ ডিডি?'

'আমার ফুল।'

'আল্‌ কি?'

'আর? আমার পড়ে পাওয়া ধন।'

খোকা হাসে খিল্‌ খিল্‌ করে। রক্তে রক্তে চোরা বান ডাকে অমলার। ঝিম্‌ ধরে যায় মাথায়, টলে সর্বাঙ্গ। বুকের থেকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে গলার কাছে।

কখনো খুকী অদ্ভুত কথা বলে, 'আমরা যদি না হতুম?'

'তবে মরে যেতুম।'

'তবে যে তুমি বল, কেন আমরা এলুম।'
'বলি, তোরা যে বড় হতভাগা।'
খুকী বলে, 'অমলামাসীর ছেলে হবে না মা?'
'না।'
'কেন?'
'কি জানি।'
তারপর একেবারে নীরব হয়ে যায় সব। তখন আরতি দুজনকে বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। অমলা নিঃশব্দে ছুটে যায় উপরে। কখনো বাগানে। কি যেন আছে শরীরের গুপ্ত কোষে কোষে। বাঁধা আছে, মুক্তি চায়।
প্রমথ দেখেও দেখে না। বলেও বলে না। তার সোহাগ সম্ভোগের পালে কখনো বাতাসের অভাব হয় না, ছেদ পড়ে না কাজে।
একদিন থমকে দাঁড়াল অমলা। স্ক্রু দিয়ে কে যেন এঁটে দিল পা দুটো সিঁড়ির নীচে, ঘরের কোণে।
খোকা বলছে, 'বল্ না মা, কি কলে পেলি আমাডের?'
আরতি বলে, 'হেসে হেসে, কেঁদে কেঁদে…'
খুকী বলে, 'সেই গল্পটা বলো না মা।'
আরতি বলে, 'কোন্‌টা? রাজকন্তের? আচ্ছা, চুপ করে শোন তবে।'
ফিরতে গিয়েও দাঁড়াল অমলা। আরতির গলা শোনা গেল, 'এক রাজা, তার এক কন্তে। রাজকন্তের বড় অসুখ। খায় না, দায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। রাজা ভাবে, রানী ভাবে, মন্ত্রী ভাবে, কোটাল ভাবে, রাজ্যময় সংবাদ রটে। ওঝা আসে, বদ্যি আসে, রাজকন্তের অসুখ আর সারে না। কি হল, কি হল? শেষে রাজা গিয়ে কন্তেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বল মা, কি হলে তোমার অসুখ সারে।

কি তোমার চাই।' রাজকন্যে ফুঁপিয়ে বলল, 'আমার ধুলোমুঠি কাপড় চাই।'…ও! ধুলোমুঠি কাপড় চাই? এই কথা? রাজা হাসে, রানী হাসে, রাজ্যময় সবাই হাসে। রোগ ধরা পড়েছে। দিকে দিকে ঘটক ছুটল, বাজনা বাজল। রাজকন্যের বিয়ে হল। লোক লস্কর, খাওয়া দাওয়া কত কি! দশমাস দশদিন বাদে রাজকন্যের ছেলে হল. হামা দিতে শিখল। ছেলে নতুন কাপড় পরে ধুলোয় পড়ে খেলল, গড়াগড়ি দিল। সেই কাপড় বুকে নিয়ে রাজকন্যে বলল, 'এই যে আমার ধুলোমুঠি কাপড়, এতদিনে পেলুম।' রাজকন্যে যে ছেলে চেয়েছিল!'

শুনে হাসি ধরে না খোকা খুকীর। ওইখানে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল অমলা। বুকে হাত দিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল সে। নিশি পাওয়া রাত্রিঞ্চরীর মতো ছুটে গেল বাগানে। দু-হাতে বুক চেপে বসল ঝোপে, তাকিয়ে দেখল নিজের কোলের দিকে। নিশিঘোরে চলে এল আবার উপরে। রাজকন্যা কাঁদছে বুকের মধ্যে। আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে চলে এল প্রমথর ঘরে।

সব বাধা পেরিয়ে, সব অভিমান ছেড়ে, সমস্ত লজ্জা ছাড়িয়ে এসে বসল প্রমথর কাছে, গায়ে গায়ে। রক্ত ছুটে এল প্রমথর মুখে। একটা ঠাণ্ডা হিম স্পর্শ কিলবিল করে উঠে এল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। কেমন যেন চাপা আতঙ্কে থম্ থম্ করে উঠল মুখটা। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না।

অমলা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'একটা গল্প শুনবে?'

শ্বাসরুদ্ধ নির্বাক প্রমথ। লেন্সের আড়ালে চোখ দুটো শবের মতো নিষ্পলক।

অমলা ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল রাজকন্যার গল্প। বলল, 'রাজকন্যে

ধূলিমুঠি কাপড় চেয়েছিল।'

প্রমথর উত্তেজিত হাতের ঠেলা লেগে একটা ভারি শব্দ করে পড়ে গেল লোহার পেপারওয়েট। সে উঠে দাঁড়াল। লেন্স্ দুটো গগল্সের মতো কালো দেখাল। সে যেন আততায়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করল। চাপা তীব্র গলায় বলল, 'আমি চাইনে।'

যেন জানত অমলা। তবু চিত্রাপিতের মতো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রমথর দিকে। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখটা। সেই না-বলা কথা বলাবলি করল তারা আজ পরস্পব। আর সাতটা বছর যেন ভেঙে পড়া পাহাড়ের মতো ধ্বসে গেল হুড়মুড় করে।

চোখ দুটো অন্ধ হয়ে এল অমলার। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কেন, কেন গো?'

একটুও ব্যথা লাগল না প্রমথর। চোখের জল কয়েক ফোঁটা অ্যাসিডের মতো জ্বালিয়ে দিল তার বুকটা। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার মুখে। আশ্চর্য! কোন্ অন্ধগুহায় সঞ্চিত ছিল এত ঘৃণা। বলল, 'চাইনে এ তুচ্ছ চাওয়া। এতবড় পৃথিবী, এত অসংখ্য চাওয়া, তার মধ্যে এ অপরিহার্য নয়।'

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রমথ। যেন তার সেই অযাচিত বস্ত্র ঘিরে ধরেছে তার সর্বাঙ্গ। বারবার তাকে ঝেড়ে ফেলার মতো করে বলল, 'চাইনে। ঘৃণিত···নোংরা···।'

ঘৃণিত! নোংরা! অমলার কানে যেন তীক্ষ্ণ শলাকা খোঁচাতে লাগল। যেন তার জীবনকে, তার সমস্ত সত্তাকে, তার সমস্ত অধিকারকে আঘাতে আঘাতে ঝেড়ে ফেলতে লাগল প্রমথ। কেন? কী লজ্জা! কী ভয়ংকর লজ্জা, অবহেলা, অপমান! কেন বলতে গেল সে। কেন বলাবলি হল।

প্রমথ বেরিয়ে গেল। চারপাশ থেকে ঘিরে এল আলমারিগুলি। অনেক বই, অনেক রকম দর্শন, সমাজ শিক্ষা, শাস্ত্র। তার মাঝে ধুলোমুঠি কাপড়কে ছিন্নভিন্ন করে সমস্ত বইগুলি যেন ব্যঙ্গ করে হাসছে। প্রমথর নাম-ছাপা বই। দেয়ালে হাসছে লণ্ডনের শিশুদের একটা প্রকাণ্ড ছবি।

তবু রক্তকণায় কণায় দোলা তো থামে না।

কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে ছেদ পড়ল না কোথাও। ভাঙন ধরল না কোন রাত্রির বুকে। ফাল্গুন গিয়ে এল চৈত্র। পাগলা বাতাসে ঘূর্ণির লক্ষণ। চৈতালী ঘূর্ণি। এক মাস চলে গেছে। কুঞ্জদা লোক পাঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন আরতিকে। আশীর্বাদ করেছেন প্রমথ আর অমলাকে। আরতি যাওয়ার সময় কেঁদেছে। ছোট্ট মেয়েটি বিদায় নিয়েছে করুণ হেসে। ছেলেটি কোল ধামসেছে, 'আম্‌লা মাছিকে' সারা গায়ে আদর করে চুমো খেয়ে গেছে। রক্তের মধ্যে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বালাটা বাড়ছে, বড় হয়ে একটা মূর্তি ধরেছে।

একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে সারা বাড়িটা। এত নিঃসঙ্গ, এত ফাঁকা তো কোনদিন ছিল না। ঝোড়ো হাওয়া যে এ বাড়িটার গায়ে এমন শব্দ করে মরে, তা তো আগে শোনা যায়নি।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে অমলা তার সেই পুরনো স্বরটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। বলল, 'বাড়িটা কী ফাঁকা!'

প্রমথ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, চিরদিনই ছিল।'

'চিরদিনই থাকবে?'

প্রমথ দৃঢ়স্বরে বলল, 'হ্যাঁ। এই তো আমি চেয়েছিলুম, তুমি আজ সব ভুলে যাচ্ছো।'

'কি চেয়েছিলে?'

প্রমথ বলল, ‘এই নিঝুমতা, আমার এই স্টাডিরুম, যে স্টাডিরুমের কথা বলাবলি করে সারা কলকাতার লোক। ফিউডাল ভাঁড়ামির শিকড় উচ্ছেদ করে আমি আমার এক জ্ঞানতপস্যার আশ্রম করতে চেয়েছিলুম এটা। যেখান থেকে এই সমাজের স্তরে ছড়িয়ে পড়ব আমি। আমার শিক্ষা, আমার কাজ…’

‘আর আমি ?’

প্রমথ উত্তর দিল, ‘তুমি আমার সঙ্গিনী, সহধর্মিণী।’

‘তোমার কোন্ সঙ্গের, কোন্ ধর্মের ?’

‘আমার কাজের—’

‘আর তোমার দেহের।’

স্তব্ধ হল প্রমথ। তার মুখের আড়ষ্ট রেখাগুলি তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল, ‘তাই। দেহকে তো বাদ দেওয়া যায় না।’

কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল অমলার মুখে। তীব্র গলায় বলল, ‘বাদ দিতে হয় শুধু তার ফলকে। তোমার এই অফুরন্ত ভাণ্ডারে গলা টিপে মারতে হয় তাকে, অপমান করতে হয়।’

বাষ্পরুদ্ধ হল অমলার গলা। প্রমথ বলল, ‘না। কে না জানে, আমি আজ ছড়িয়ে আছি হাজারো শিশুকে নিয়ে, হাজারো মায়েদের নিয়ে। দেশের সেই ফলকে নিয়েই আমার দিবানিশি কাজ।’

এতদিন এত করেও আজ অমলা বলল, ‘তাতে আমার কি ? আমি কি পেলুম ?’

‘যা আমি পেয়েছি।’

অমলা বলল, ‘তুমি যা পেয়েছ, আমি যে তার কিছুই বুঝিনে। আমি তোমাকে সব দিয়েছি। আমার সব নিয়ে তুমি আমাকে কিছুই দাওনি। তোমার আমার এই প্রতিদিনের নিষ্ফল দেহ কিছুই

নয়, কিছুই দাওনি তুমি।'

প্রমথ অস্থিরভাবে ঘৃণাভরে বলে উঠল, 'সবই দিয়েছি। ওটা দেওয়ার কিছু নয়।'

ফিস্‌ফিস করে চাপা গলায় বলল অমলা, 'কেন নয়? তোমার মাতৃসংঘে আর একটি মা বাড়বে। তোমার শিশু সমিতিতে একটি নতুন নাম লেখা হবে।'

'না।' তীব্র ঝাঁঝালো গলায় হিসিয়ে উঠল প্রমথ, 'এখানে আর কিছু থাকবে না। এখানে, এই বাড়িতে, এই ঘরে, তোমার আর আমার মাঝখানে—'

'—শুধু তোমার কাছে আমি……?' কথাটা শেষ করতে পারল না অমলা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে চৈত্র বাতাসের হাহাকার। রাত্রিটা কোথায়, কোন্ অন্ধকারে বুক চেপে কাঁদছে।

সমস্ত চৈত্ররাত্রিগুলি কেঁদেছে মাস ভরে। রাত্রে শোবার ঘরে প্রমথ পায়চারি করেছে একলা। দিনে দিনে তার মূর্তিটা যেন আরও বড়, বিশাল শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে। ঘাড়ের পাশের মাংসপেশীগুলি হয়ে উঠেছে আরও সবল শক্ত। নিঃশব্দে ফুঁসছে কেবলি। পাশের ঘরের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থেকেছে অমলা। শীর্ণ হয়েছে। কালি পড়েছে চোখের কোলে। তবু অপমান-কালো মুখ নিয়ে দিনের বেলা সে বেরিয়েছে প্রমথর সঙ্গে, কাজ করেছে, খেয়েছে। শুধু যে রাত্রির চেহারা করাল হয়ে উঠেছে তার কাছে, সেই রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। সাত বছরের সমস্ত রাত্রি তাকে ব্যঙ্গ করেছে। সাত বছর ধরে তার নারীত্ব মিটিয়েছে একটা বোবা ক্ষুধা।

ক্লীব-বাসরের অভ্যাসের দাসী হয়ে সে ফিরেছে এতদিন মহা আনন্দে। আশ্চর্য! কী অদ্ভুতভাবে আজ সমস্ত ব্যাপারটা তার আসল চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার চাওয়া, চাইতে যাওয়া এক ভয়াবহ লজ্জাকে শাড়ির ফাঁস দিয়ে হত্যা করতে চাইছে। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বাড়িটা একটা ভয়ংকর মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় তার সামনে। সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে, তার না-দেখা প্রমথর বাবাকে, মাকে, মামা আর তাব বন্ধুদের। তারপর চমকে আতঙ্কিত চোখে দেখে তার সামনে এক মূর্তি। তার চোখ নেই, মুখ নেই, মাথায় চুল নেই। শুধু বিশাল ভয়ংকর মূর্তি। অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ে দেখে, সে মূর্তি প্রমথর। পোশাক বদলে এসেছে সেই পুরনো ক্লীবটা। সে শুধু সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনে অমলাকে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

অন্ধকারে নিজের বুকে হাত বুলোয় অমলা। বুকে, পেটে, তার সর্বাঙ্গে। বিচিত্রানুভূতি জাগে তার শরীরে আর মনে হয়, সমস্ত রক্ত বুকে জমে বিন্দু বিন্দু হয়ে ক্ষরে পড়ছে।

প্রমথ প্রতীক্ষা করছিল আর জলছিল তীব্র ঘৃণায়। সে আশা করছিল, তার যুক্তি ও পৌরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে অমলা। গাইবে তার বুকের কাছে এসে, 'ওহে সুন্দর! মরি মরি!' কিন্তু প্রতীক্ষা যত দীর্ঘ হচ্ছিল, ততই বাঁধ ভেঙে পড়ছিল তার। নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছিল।

বিকালে তৈরি হল না অমলা বেরুবার জন্যে। ঝিমিয়ে পড়া বাতাসের বৈশাখী বিকাল। গাছপালাগুলি সব থম্‌কে গেছে। একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসছে চারদিক থেকে। গুমোট আর অন্ধকার ভিড় করে আসছে যেন।

প্রমথ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

আজ প্রত্যহের বিকালেও ছেদ পড়ছে।

হঠাৎ বাতাস উঠল। বড় রাস্তার ট্রামের ঘরঘরানি গোঁ গোঁ করে ধেয়ে এসে ধাক্কা দিল কানের কাছে। প্রমথ আক্রোশে অচৈতন্য অস্থির পায়ে এসে দাঁড়াল অমলার কাছে। বলল, 'বেরুবার সময় হয়েছে।'

অমলা শান্ত গলায় জবাব দিল, 'জানি। তুমি যাও। আমি একলা যাব।'

অসহ্য ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠল প্রমথর মুখ। বলল, 'না, তা যাওয়া হবে না।'

চকিতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলল অমলা, 'কেন?'

কেন? কেন? চোখের লেন্স দুটো নীলচে ইস্পাতের মতো ঝকঝকিয়ে উঠল। 'কোনদিন যাওনি। সাত বছরের প্রতিটি দিন, এই সন্ধ্যায়,—'

সাত বছরের প্রতিটি দিন। কান্নাচাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে উঠল অমলা, 'প্রতিটি দিন তুমি ভুলে গেছ, আমি একটা মেয়ে।'

'হ্যাঁ, নক্কারজনক, আদিম, ভাল্‌গার একটা মেয়ে।'

কঠিন হয়ে উঠল অমলার মুখ। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে জোর করে নীরব রইল সে। প্রমথ তীব্র চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, 'আজকের অযোগ্য, রুচিহীন। যখন মেয়েরা খুঁটে খেয়ে বাঁচতে চাইছে, বাঁচার জন্যে ছুটেছে—'

'হ্যাঁ, বাঁচার জন্যে।' তীব্র গম্ভীর গলায় বলে উঠল অমলা, 'কিন্তু মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের মতো করে। তুমি আমার সে অধিকারটুকুও মানোনি। বলো না, বলো না তুমি আজকের মেয়েদের কথা।'

কিন্তু বিদ্বেষে অন্ধ প্রমথ বলে চলল, 'আর তুমি, খেয়ে, পরে, একটা পুরুষের সামনে নির্লজ্জের মতো…'

কানে আঙুল দিয়ে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল অমলা, 'বলো না,

বলো না। বড় নির্লজ্জ। মেয়ে হয়ে এত লজ্জা আর সইতে পারিনে, পারিনে।'

বলে সে তড়িৎপায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে স্তব্ধতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল বাইরের ঝড়ের শব্দ। ধুলোর ঝড় আর অন্ধকার। মেঘের গর্জন আর বাতাসের শাসানি। দুজনেই স্তব্ধ নির্বাক্। বাক্‌হীন প্রমথ, ভীত আতঙ্কিত লেন্স দুটো দিয়ে তাকিয়ে রইল অমলার দিকে। তার প্রতি রাত্রের সেই লালসাতৃপ্ত চোখ, যে চোখ ওই দেহ লেহন করতে না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, আর যেন চিনতে পারছে না অমলাকে। বাতাস ঢুকছে ঘরে। লণ্ডনের শিশুদের ছবিটা যেন খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল তার আর অমলার মাঝখানে এসে। দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে সে বলে উঠল, 'না, না, পারব না।'

কি যেন বলল অমলা ফিস্‌ফিস্ করে। ছিটকে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল দড়াম্ করে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হল, তারপর হারিয়ে গেল হাওয়ায়।

সাত বছর আগে একদিন যে গান গেয়ে ঢুকেছিল এ বাড়িতে, সে গান গাওয়া তার শেষ হল না। 'ওহে সুন্দর, মরি মরি!' সুন্দর থেকে সুন্দরতরকে চেয়েছিল সে। হে সুন্দর। কী সুন্দর।

কী সুন্দর তুমি।

দুরন্ত ঝড়, আঁধি বইছে। বাগানটা লুটোচ্ছে। হাট করে খুলে গেছে গেটটা। চাকরটা বড় বড় চোখে হাঁ করে চেয়ে দেখছে অমলাকে। উপরে সেই দরজাটায় একটুও শব্দ নেই।

গলির রকে ছেলেগুলি দেখলে বলত, 'আরে শালা! জোড়া যে ভাঙা দেখছিরে!'
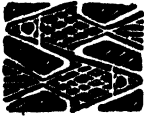
উরাতীয়া

যখন বেলা পড়ে আসত, সারাদিনের রোদজ্বলা আকাশটায় ছড়াতো রঙের তীব্র ছটা, জনহীন হয়ে আসত মাঠ ও বন, তখন মনে হত রেললাইনের উঁচু জমিটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন সারাদিন পরে নুয়ে-পড়া মাথাটা আড়মোড়া ভেঙে তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। আর গাঢ় বর্ণের আকাশটা যেন নেমে আসত একটু একটু করে। আকাশটাই ঘিরে থাকত উঁচু জমিটাকে।

তখন দূর থেকে মনে হত দুটো অতিকায় দানব নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ওই উঁচু জমিতে। বিশ্বসংসারের এ নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের সুযোগে তারা নেমে এসেছে ধরাতলে। আকাশের অনেকখানি জুড়ে থাকত তাদের বিশাল দেহ। তাদের স্ফীত সুগঠিত মাংসপেশীর প্রতিটি সুস্পষ্ট রেখা ঢেউ দিয়ে উঠত আকাশের বুকে। তারপর, যখন তারা হঠাৎ খানিকটা সরে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াত মুখোমুখি, এবং পরস্পরকে আচমকা আক্রমণ করে উঠত পড়ত, তখন শক্তি প্রয়োগে মাংসপেশীগুলি আরও উদ্দাম হয়ে উঠত। আকাশের বুকে ছিটকে যেত ধুলো মাটি। উঁচু জমিটা যেন থরথর করে কাঁপত তাদের দেহ ও পায়ের চাপে। তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ভয়ংকর দৃশ্যের অবতারণা হত সন্ধ্যাকালের এ জমিটার উপরে।

তারপর এ লড়াই চলতে চলতে, রঙে রঙে আকাশটা যখন কালো হয়ে আসে, জমি আর আকাশ হয়ে যায় একাকার, তখন তারা দুজনেই আকাশমাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যায়।

এমনি ঘটে রোজই। লড়িয়ে দুই মস্ত মল্লবীর। লাখপতি আর ঘামারি। তারা দুজনেই রেলওয়ে গেটম্যান।

মফস্বল শহর থেকে মাইল সাত আটেক দূরে, স্থানীয় স্টেশন থেকেও প্রায় দু-মাইল দূরে, মাঠের মাঝে এ ক্রসিং গেট। লাইনের পুবদিকের গ্রামটা কিছুটা কাছে। পশ্চিমের গ্রামটা একটা ঝাপসা কালো রেখায় মিশে থাকে আকাশের গায়ে। গেটের দু-দিকে দুটো ঢালু সড়ক নেমে গেছে এঁকেবেঁকে, হারিয়ে গেছে মাঠ ও গ্রামেব মধ্যে। চওড়া সড়ক। গোরুর গাড়ির চাকার দাগে দু-পাশে গভীর রেখা পড়েছে। আর চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

ক্রসিংএর দু-পাশে ঢালু জমিতেই গেটম্যানদের ঘর। এমনভাবে ঘর দুটো তৈরি হয়েছে, রেললাইনের উপর থেকেই লাফিয়ে ঘরের ছাদে চলে যাওয়া যায়। এপার থেকে ওপারের ঘর দেখা যায় না। ওপার থেকে এপারেরও না।

কাছাকাছি কোন বড় গাছপালা নেই। পাখীর কলরব বড় একটা শোনা যায় না। এখানে সারাদিন প্রজাপতি ফড়িং রঙিন পাখা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়। ঝিঁ ঝির গলা-কাটানো ডাক আরও ভারি করে তোলে নৈঃশব্দ্যকে।

সারা দিন লোকেরও যাতায়াত কম এই পথে। সকালে আর বিকালে দেখা যায় কিছু লোককে যেতে। হয়তো যায় কয়েকটা গোরুর গাড়ি সারাদিনে। তাও গোরুর গাড়িগুলোকে অধিকাংশ দিনই বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কেননা এই সীমান্তের যারা প্রহরী, লাখপতি আর ঘামারি, তাদের যতক্ষণ দয়া না হবে, ততক্ষণ সীমান্তদ্বার খোলার কোন উপায় নেই।

তারা অবশ্য লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন গ্রামের সীমানায়,

চাকরি ছাড়া জীবনধারণের যে আর মাত্র একটি দিক তাদের আছে, তা হল মল্লযুদ্ধ। সেজন্যে দেহ তৈরির কাজটি তাদের সর্বাগ্রে। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের তৈলমর্দনের সময়, কিংবা সকালের বুকডন বৈঠকের উত্তেজনায় চোখ লাল, মাথাটা অবসাদগ্রস্ত আর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ পাগলা গতিতে থাকে লাফাতে, তখন পাচন-বাড়ি হাতে কোন গাড়োয়ানের 'খোলেন গো পবন-পো' শব্দ তাদের কানেই ঢোকে না।

পবন-পো কথাটি খুব শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই গাঁয়ের লোকে তাদের বলে। তারাও সাগ্রহে ও আত্মসন্তোষের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে। কেননা, পবনপুত্র বলতে ভীম এবং হনুমানকেই নাকি বুঝিয়ে থাকে। লাখপতি আর ঘামারি, পরস্পরকে তারা ওই শক্তিমান বীর দুজনেরই অংশবিশেষ বলে মনে করে। আর, দুই বীরেরই পুজারী তারা। বজরংবলী তাদের দেবতা। অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান।

কথাটা মিথ্যে নয়।

এই নির্জন পরিবেশে, লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দুইটি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও মুক্ত।

লাখপতি এখানে এসেছিল তার বিশ বছর বয়সে। ঘামারি তার চেয়ে বড় বছর দুয়েকের। আজ দশ বছর ধরে তারা একত্র রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা কখনো ফারাক হয়নি। এই দশ বছরের মধ্যে, পৃথিবীতে হয়েছে অনেক ওলটপালট। অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে। অনেক মানুষ জন্মেছে মরেছে। নদী ভিন্ন পথ ধরেছে, নতুন স্থলভূমি দেখা দিয়েছে, ঘটে গেছে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এমন কি, এই দূরের গ্রামগুলিতেও পরিবর্তন হয়েছে কিছু কিছু।

কিন্তু এখানে কোন পরিবর্তন নেই। উদার আকাশের তলায় এই নির্জন লেবেল ক্রসিং-এর দু-পাশে যেন পৃথিবীর কোন দুর্গম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিকতা বিরাজমান।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু লাখপতি আর ঘামারির দেহে ও রক্তে। দিনে দিনে তাদের দেহের রূপ বদলেছে। সঞ্চিত হয়েছে রক্ত, স্ফীত হয়েছে মাংসপেশী। এখন ক্রমে বাধাহীন হয়ে উঠেছে যেন তাদের রক্তপ্রবাহ। দেহের মধ্যে সে অস্থির, প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ংকর বন্যতা ফেটে পড়তে চাইছে। ক্রমিক অধ্যবসায়ে একদিন যা ছিল কোমল, সুন্দর ও সুগঠিত, আজ তা বন্য পাহাড়ের মতো খোঁচা খোঁচা পাথর। তাদের প্রেম, ভালবাসা, তাদের হাসি খুশি, আলাপ-আলোচনা সব এই দেহকে ঘিরে। এই দেহ ও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বই মল্লযুদ্ধ। আর দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়েছে রেল-লাইনের তারের বেড়ার বাইরে তাদের মল্লভূমির প্রশস্ত স্থানটুকু। সেই মাটিটুকুকেও তারা দেহের মতো ভালবাসে, দেহের মতোই তার সেবা করে, তার প্রতিটি কণাকে তৈরি করে। এই মাটিতে তাদেরই গায়ের গন্ধ, তাদেরই ঘামে তাদেরই উত্তাপে শুকনো ও ঝুরঝুরে।

এবেলা, ওবেলা, দিনে ও রাত্রে কয়েকবার করে নিশান দেখানো, দেখানো নীল আলো, তাদের কাছে কোন কাজই নয়। মাসে তারা একবার করে সাত আট মাইল দূরের জংসন স্টেশনে যায় মাইনে আনতে। খোরাকি ও দরকারী বস্তু কিনে নিয়ে আসে তখনই। বাদবাকি দরকার দিনে একবার করে গাঁয়ে গেলেই মিটে যায়। তাদের দুজনের দুটো গোরু আছে। কিনতে হয়নি, দিয়েছে পুষতে-না-পারা হা-ভাতে গাঁয়ের লোকেরা। গোরু পুষতেও তাদের ভাবতে হয় না। লাইনের ধারে বেঁধে দিলেই জীব দুটির পেট ভরে। রাত্রে

কিছু জাব আর জল। তাইতেই দুধটা তাদের লাভ। সকালের দুধটা এসে একজন নিয়ে যায়। বিকালের দুধ তারা তাদের কুস্তির পর, জলের মতো কাঁচাই পান করে। রাঁধে খায় এক সঙ্গে, থাকে সারাদিন এক সঙ্গে, রাত্রে শোয় আলাদা।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, এই কাজগুলি সামান্য। কিন্তু এই নির্জন পরিবেশে যা একদিন প্রয়োজনের জন্যে তারা আরম্ভ করেছিল, আজ তা দারুণ নেশার মতো জড়িয়ে ধরেছে রক্তের মধ্যে। অসামান্য হল দেহ-চর্চা। রাত পোহালেই রক্তপ্রবাহে জাগে কলরোল। দেহের মধ্যে আছে তাদেরই অপরিচিত আর একটা খ্যাপা জীব। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে, প্রতিটি ধমনীতে সে পাগলের মতো খোঁচাতে থাকে, ছুটোছুটি করে।

তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। তখনই ল্যাঙট এঁটে, তুলসীমঞ্চের গর্তে সযত্নে রক্ষিত হনুমানের ছোট্ট মূর্তিটিকে নমস্কার করে বুকডন বৈঠকে মেতে যায় তারা। বিকাল না হতেই আবার সেই। বজরংবলীর পুজা, তৈলমর্দন, ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ।

মল্লযুদ্ধ শেষে দুধের মধ্যে বাটা সিদ্ধি মিশিয়ে খায়। খেয়ে গরিলার মতো রক্তবর্ণ দুটো চোখে স্নেহ ও সোহাগভরে দেখে শুধু, নিজেদের দেহ। যেন তাদেরই পোষা দুটি অতি স্নেহের জীব এই দেহ দুটি।

এই সময়ে তাদের অতি ভয়ংকর দেখায়। মাথা আর ঘাড় তাদের সমান হয়ে উঠেছে। কোথাও যেন উঁচুনীচু নেই। কান দুটোও আঘাতে আঘাতে দুমড়ে চেপটে যেন অনেকখানি মিশে গেছে। মল্লবীরদের নিয়ম তাই। কান পিটিয়ে পিটিয়ে একটা ড্যালা ডুমড়ি গোছের করে ফেলতে হয়। সেই কানে আবার অতি যত্নে পরানো

আছে সোনার মাকড়ি। নাকগুলি চেপটে এঁকেবেঁকে গেছে। চোখের কোল ও গালের মাংস শক্ত ও ফোলা। চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছে কোটরে। ঘাড়ের মাংসপেশী যেন নিয়ত আক্রমণোদ্যত ভাল্লুকের মতো ঠেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

তারা বসে থাকে মুখোমুখি। আর তাদের মুখোমুখি হাঁ করে চেয়ে থাকে মাঠ, বন, সপিল সড়ক আর আকাশ। তাদেরই ক্লান্তি ও অক্লান্তিতে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডাকে ঝিঁঝি।

তখন ঘামারি হয়তো বলে 'আচ্ছা লাখুয়া, ভীমের চেহারাটা কিরকম ছিল বলতে পারিস ?'

কথাটার মধ্যে কোন ঠাট্টার আভাস নেই। লাখপতি একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে শুনেছি দৈত্যের মতো। তা নইলে আর হিড়িম্বা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল ?'

ঘামারি বলে, 'হুঁ, ঠিক।'

ভীম হনুমান, এদের নিয়ে প্রায়ই তারা এরকম আলোচনা করে। ইচ্ছে করে নয়। আপনি ওসব কথা তাদের মনে আসে।

কোন সময় হয়তো লাখপতি বলে, 'জানিস্ ঘামারি, আমার মনে হয় মহাবীর হনুমান আমাদের জরুর দেখভাল্ করে, আসে এখানে।'

অমনি ঘামারির ভাং নেশাচ্ছন্ন লাল চোখ দুটো ওঠে চকচকিয়ে। বলে, 'হ্যাঁরে, আমারও শালা এরকম মনে হয়।'

বলতে বলতেই আপনি তাদের বিশাল দেহের মাংসপেশীগুলি নাচতে থাকে।

তখন ঘামারি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস। এ রেললাইনের জমিটা আমি একলাই সিরিফ্ গর্দানের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি। কেন বল তো ?'

লাখপতি বলে, 'কি জানি মাইরি! আমারো শালা ও রকম মনে হয়, মনে হয়, দুনিয়াটা বেমালুম হালকা। ঘাড়ে করে নিতে পারি।'

সত্যি, দেহে তাদের এত শক্তির প্রাচুর্য যে, শুধু নেশা নয়, এমনি একটা অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করে তারা। এই প্রচণ্ড শক্তিটা এক সঙ্গে জমাট হয়ে যেন আগুনের মতো ঠিকরে পড়ে তাদের চারটে চোখে। দেহ তাদের গৌরব, তাদের সব।

তখন হয়তো ঘামারি বলে, 'আয়, আর একবার লড়ি।'

লাখপতি বলে, 'সেই ভালো।'

কিন্তু আবেগবশত যেদিন লড়ে, সেদিন সময়ের কোন স্থিরতা থাকে না। অন্ধকারে শুধু দুপদাপ, হঠাৎ চাপা হুংকারের তীক্ষ্ণ শব্দ, জন্তুর নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি রাত্রিটাকে চমকে দেয়। বিমূঢ় অন্ধকার ও নক্ষত্রখচিত আকাশ চেয়ে থাকে হাঁ করে। আর অন্ধকারেও তাদের ঘর্মাক্ত শরীরে এমন একটা চমকানি দেখা যায় যেন পাথরের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের ঝিলিক। কখনো শুধু মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পরে। তখন মন হয়, লেঠেলদের লাঠি ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

এই দৈহিক শক্তির খেলাই তাদের নেশা। তাদের মাতামাতিতে রাত্রিচর বাদুড়গুলিও দূর থেকে উড়ে যায়, জানোয়ারগুলি ফারাক দিয়ে পাশ কাটায়। কারণ প্রকৃতির গড়া ভয়ংকরের মতোই তাদের তখন দেখতে হয়।

এই দশ বছর কেউ তাদের কোথাও যেতে দেখেনি। গাঁয়ের লোক জানত তাদের কেউ নেই। তারাও সেরকমই জানত বোধ হয়। কেননা, তাদের মুখে কেউ কখনো অন্য কোন কথা শোনেনি। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কম। কেবল মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা আসে তাদের কুস্তি দেখতে। তাও ভয়ে ভয়ে। তাদের

এই নীরস দেহ সাধনা মানুষের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। নীল পুজোর দিন, গাঁয়ের মেয়েরাও আসে। আর সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার কিছু ভিড হয়। ওইদিন হাটবার। ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হয় হাটে, সেইজন্যেই ভিড়।

লোকে যেমন জানত, তাদের কেউ নেই, তারাও সেই রকম বিশ্বাস করত। কেননা, ঘামারির বৌ মরে গেছে দেশে থাকতেই। তার আর কেউ নেই। তারপর থেকে সে এখানে আছে।

লাখপতিও পিতৃমাতৃহীন। ভাইবোনও নেই। ভগবান জানে, তার বাপ-মা কি ভরসায় তার নাম রেখেছিল লাখপতি। পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দশ বছর বয়সে বাপ মা তাকে সংসারে একাকী করে রেখে গেছে। না ঘর, না ক্ষেতি গিরস্তি। ভাগ্য ভালো, খুড়ো ছিল শিয়ালদা লোকোর কুলি। সে বেঁচে থাকতেই জুটিয়ে দিয়েছিল কাজটা। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে বর-কনে বড় হলে, জোয়ান হলে গাওনা হয়। ওইটিই আসল বিয়ে। তখন থেকে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করে। কিন্তু লাখপতির ভাগ্যে তা-ও ঘটে ওঠেনি। কি দিয়ে গাওনা হবে, বৌ আসবে কোথায়।

তারপরে কাজ জুটেছে এই বাংলা দেশে। কেউ তাকে দেশে আজ অবধি ডাকেনি, সে-ও যায়নি। বৌটাকে হয়তো আর কেউ ঘরে তুলেছে, কিংবা বাপ-মা বিক্রি করে দিয়েছে কাউকে। কিন্তু সেকথা দশ বছরে দশবারও তার মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ। এমন কি পাঁচ বছরের সেই স্মৃতির কণাও নেই তার মনে।

নারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আলোচনায় খুব কম। ওদিক থেকে তারা অনেকটা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। গাঁয়ের কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করার বা মেশার অবসরও নেই তাদের।

তারা আছে তাদের কাজ, দেহচর্চা ও মল্লযুদ্ধ নিয়ে। তারা শোনে শহরের মল্লযোদ্ধাদের কথা। তারা শহরে গেলে শহরের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

তবু তাদের এই অসীম শক্তি ও বিশাল দেহের মধ্যে কি যেন আটকা পড়ে আছে। যেন একটা খাঁচায় পোরা পাখি ছটফট করছে সব সময়ই মুক্তির জন্যে। কিন্তু এই পরিবেশ ও দেহ ভেদ করে সে কখনোই বাইরে আসতে পারে না। এ যে কিসের বন্ধন, তারা জানে না। তবু, একটা দুর্বোধ্য আবেগ আসে তাদের মনে। তা-ও এতই ক্ষণস্থায়ী যে, আবার তারা মল্লভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্ত হলে পড়ে ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙেই গর্ব ও আনন্দভরে তাকায় পাহাড়ের বুকের দিকে, নাড়া দেয় মাংসপেশী। যেন পাথর কাঁপছে! তারপর আধঘুমন্ত, আড়-মাতালের মতো কাজে হাত দেয়।

দেহ প্রধান। মস্তিষ্ক যেন কোন কুলুপ কাঠি দিয়ে আটকানো, অবসাদ-গ্রস্ত, নিষ্ক্রিয়। হৃদয়টাও কেমন যেন আবদ্ধ, অন্ধকার। এই তাদের জীবন।

এমনি অবস্থায় একদিন হেমন্তের মাঝামাঝি এক দুপুরে গাঁয়ের ডাক-ঘরের পিয়ন এসে ডাকল, 'কই গো পবন-পো দাদারা।'

জবাব এল, 'এখুন দরজা নাই খোলা যাবে গো।'

পিয়নটা রীতিমত অবাক হল। চিঠি দেখে হাঁক দিল আবার, 'লাখপতি চামারিয়া কে আছেন গো আপনাদের মধ্যে?'

লাখপতি চামারিয়া? দুই মল্লবীরই উঠে এল দিবানিদ্রা ছেড়ে। তারাও ভারি অবাক।

লাখপতি বলল, 'কি হয়েছে?'

'আপনার নাম লাখপতি চামারিয়া?' গ্রাম্য বাঙালী পিয়নটা

ঘামারিয়া পদবীকে একটা বর্ণহিন্দুর পদবী ঠাউরেছে বোধ হয়।
লাখপতি বলল, 'হাঁ হাঁ।'
'আপনার একটা চিঠি আছে।'
'ইংলিশ চিঠি?'
'না। হিন্দী।'
বোঝা গেল আপিসের নয়। লাখপতি আর ঘামারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মাটি কাঁপিয়ে গিয়ে চিঠিটা নিল। পড়বে কে? ঘামারি সামান্য পড়তে জানে। তবে দেহাতী অক্ষর। সৌভাগ্যের বিষয় চিঠিটা ধুলোকাদামাখা দোমড়ানো হলেও দেহাতী ভাষায় লেখা।
পিয়ন বলল, 'ছ-মাস আগে চিঠিটা আপনাদের হেড আপিসে আসছে, এখানকার ঠিকেনা নাই কি না? তা কি বিত্তান্ত?'
দুজনেই তাড়াতাড়ি খাটিয়া পেতে বসল পড়তে। প্রথম অক্ষরটি পড়তে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগল। পিয়ন বিদায় হল হতাশ হয়ে।
বিকালের দিকে চিঠি পড়া শেষ হলে তারা অবগত হল, চিঠিটা দিচ্ছে লাখপতির বিধবা খুড়ী। বক্তব্য, সে এবার মরবে। আশা করছে, এতদিনে লাখপতি গুছিয়ে নিয়েছে। সে যেন তার বৌকে এবার নিয়ে যায়। বৌ খুড়ীর কাছেই আছে। তাই উপদেশ হচ্ছে, জোয়ান আওরত, খর নদীর নৌকো। মাঝি হাল না ধরলে এবার তরী যাবে। অতএব আর দেরি নয়।
দুজনেই তারা তাদের এবড়ো-খেবড়ো মুখ দুটো আরও ভয়ংকর করে বসে রইল। জীবনে একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিতান্ত আচমকা। হোক দেহের মধ্যে সীমিত, তবু জীবন তাদের ওখানেই পরিপূর্ণ। দেহের নানা স্থানে কতগুলি মাংসপেশী ফুলে উঠে অস্বস্তিতে থমকে রইল।

ঘামারি বলল, 'অওরত ?'

লাখপতি বলল, 'এখানে ?'

একটা ধিক্কার দেখা দিল তাদের চোখে। কিন্তু এদিকে বিকালের অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাদের রক্তধারায়। কথা অসমাপ্ত রেখে নেশার ডাকে সাড়া দিতে চলল তারা। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম মল্লক্ষেত্রে।

তারপর রাত্রে যখন দুধ সিদ্ধি খেয়ে বসল দুজনে, তখন একই ভাবনা ঘিরে এল আবার তাদের মনে। দেহকে ঘিরে তাদের ঘোর স্বার্থ-পরতা, পৃথিবীর আর সবদিক থেকে এমনিভাবে বিমুখ করে রেখেছে চোখ ও মন। তাদের দেহ সাধনার যে পরম আনন্দ, তাতে এক নিরানন্দের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। এই দেহ থাকলে তার সুখ, পরমায়ু ও ভগবান। আওরত তো তাতে শুধু ক্ষয় ধরিয়ে দেবে। অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে একবার দেখল। তারপর স্থির হল, এটা নিশ্চয়ই মহাবীরের ইচ্ছা। সুতরাং আনতেই হবে। তবে লাখপতি তার এই দেহের ভাগ তাকে একটুও দেবে না। দুই বন্ধু এই স্থির করল। বৌ থাকবে নিজের কাজ নিয়ে।

তারপর ছুটি নিয়ে লাখপতি দেশে গেল। নিয়ে এল বৌ।

ছাব্বিশ বছরের এক মেয়ে, নাম তার উরাতীয়া। খুড়ী শাশুড়ীর ঘরে ক্রীতদাসীর মতো খেটে-খাওয়া মেয়ে। স্বাস্থ্য ও যৌবনে পুর্ণ তার সুগঠিত দেহ। বেশ আঁটো, সামান্য খাটো, রংটা আধা ফরসা। রূপসী বলা যায় কি না জানিনে। তার নিরাভরণ শরীরের পুষ্ট হাত-পায়ের গোছায় একটা বিহারী রুক্ষতা, কিন্তু চোখ দুটি ভরা কালো দীঘির মতো ভাসা ভাসা অথচ গভীর। আর, হয়তো প্রথম স্বামী সাক্ষাতের গোপনলীলায় একটা দুর্বোধ্য হাসি তার গালের টোলে।

একটা হলদে শাড়ির ঘোমটা টেনে সে এল লাখপতির সঙ্গে, হাতে পুঁটলি ঝুলিয়ে। এল নির্জন মাঠের বুকে, লেবেল ক্রসিং-এর ঢালু জমির কোলে গেটম্যানের ঘরে। একদিন যাদের পদক্ষেপে ঘরটা কাঁপত, আজ আর একজনের পদসঞ্চারে সেই ঘর নিঃশব্দ, কিন্তু বিচিত্র শিহরণে, পুলকে ভরে উঠল। মল্লবীরের সাজানো-গোছানো গুমটি ঘরে আলো এল, হাওয়া বইল।

ঘামারি এসে দাঁড়াল। লাখপতি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বুকে বুক ঠেকাল। কয়েকদিনের যন্ত্রণাকাতর চাপা পড়া রক্তধারায় জোয়ার এল আবার। তারপর দুই মল্লবীর চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল দুজনকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু-জোড়া চোখ।

লাখপতি বলল, 'চল্, একবার দেখা যাক।'

ঘামারি বলল, 'তুই দেখিস্‌নি?'

লাখপতি বলল, 'ধু-স্ শালা মনেই হয়নি। চল্ এক সঙ্গে দেখি গে।'

ঘামারি বলল, 'কি আর দেখব? অওরত অওরত।'

লাখপতি উত্তর দিল, 'তবু একবার—'

দুজনে হাত ধরে ঘরে ঢুকল। উরাতীয়া বসে রয়েছে ঘোমটা টেনে। তারা দুজনে বসল অদূরের খাটিয়ায়। উরাতীয়াকে দেখে আর চোখাচোখি করে।

একটু পরে উরাতীয়া ঘোমটা তুলে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার কালো চোখে। দুজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই শান্ত অথচ মিঠে হাসি চমকে উঠল তার চোখে ও গালের টোলে। মাথাটি গেল নেমে। রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে।

হাসি দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মল্লবীরেরা। আবার উরাতীয়ার চোখ উঠল, দূর মেঘে যেন হালকা বিদ্যুৎ চমকালো মিঠে

হাসির। বিশালদেহ তুই বন্ধু আবার মুখ চাইল পরস্পরের। তারপর হেসে উঠল। হাসতেই লাগল উচ্চরোলে। যেন এক রুদ্ধধারা হঠাৎ মুক্ত হয়ে অনর্গল বয়ে চলল অট্টরবে।

আর সেই অট্টরবের সঙ্গে এক বিচিত্র সুর যোজনা করল নূপুর নিক্কনের মতো চাপা গলার খিলখিল হাসি। থরথর করে কেঁপে উঠল উরাতীয়ার শরীর ও ভাঙা খোঁপা।

এমনই অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় এই বিচিত্র হাসির রোল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্রসিং গেটের এই চারপাশের সীমা, তার বনপালা সড়ক ও আকাশ থমকে রইল এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই হেমন্তের অপরাহ্ন নেচে উঠল হাওয়ায়। ইতিহাসের যুগ ফিরে এল যেন সমস্ত পরিবেশটায়। আর এল মাঠের পাকা আমনের গন্ধ, গভীর হাম্বা রব, মাঠের মানুষের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। আর আশ্চর্য! এই কান পেটানো, নাক থ্যাবড়া, চাঁছা মাথা, এবড়ো খেবড়ো-মুখ এই পাহাড়ে মানুষ তুটোকে দেখে একটু ভয় পেলে না গেঁয়ো উরাতীয়া। সে সমানতালে হেসে হাসিয়ে এক নতুন রং ছড়িয়ে দিল এখানে। তারপর খুলে ফেলল তার পুঁটুলি।

কণ্ঠরোল থামল। কিন্তু যেন যুগ-যুগান্তের চাপা পড়া হাসি কাঁপতে লাগল মল্লবীরদের পেশীতে পেশীতে, হাসতে লাগল গর্তে-ঢোকানো চোখ। নিজেদের হাসিতে তারা নিজেরাই বিস্মিত কৌতূহলিত হয়ে দেখল আবার উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া পুঁটুলি খুলে বার করেছে বাঁকমল। পরেছে পায়ে। এইটুকু তার বাপের বাড়ির সম্বল। লুকিয়ে রেখেছিল খুড়ী শাশুড়ীর ঘরে এসে। আসল লোকের ঘরে এসে একদিন সে পরবে, এই ছিল সাধ। আজ তা পূর্ণ হল।

মল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। অসংকোচে ঘুরল সারাটি ঘর। আপন মনে হেসে হেসে দেখল চারদিক। রাবণের লঙ্কা পোড়ানো, গন্ধমাদন বহন, বুক চিরে দেখানো রাম-সীতা এমনি ছ-সাত রকমের শুধু মহাবীর হনুমানের ছবি টাঙানো আছে ঘরটায়।

তারপব বাইরে এসে দাঁড়াল উরাতীয়া। দুই মল্লবীর বন্ধুও উঁকি মেবে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপাব। উরাতীয়া গিয়ে দাঁড়াল তুলসী-মঞ্চের কাছে: নীচু হয়ে দেখল মহাবীর হনুমানের মূর্তি। সেখানে গড় করল। মল্লক্ষেত্রের চারপাশে দুই বন্ধু লাগিয়েছিল বেল ও গাঁদার চারা। সৌন্দর্যের জন্যে নয়। মল্লক্ষেত্রেব পবিত্রতার জন্যে। হনুমানজীর পুজোর জন্যে। কয়েকটা গাঁদা ফুল ফুটেছে এর মধ্যেই।

উরাতীয়া পটাস্ করে ছিঁড়ল একটি ফুল। আড়চোখে দেখল দুই পুরুষকে। তারপর লাইন পেরিয়ে নেমে গেল ওপারে। গিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল ফুলটি।

দুই বন্ধু এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল। দেখল, উরাতীয়া ঘামারির ঘরটিও দেখছে ঘুরে ঘুরে। তার ঘোমটা গেছে খসে। বাইরে এসে দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জার বিচিত্র রাগে, হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর একটা হাসির উচ্চরোল পড়ল ফেটে। কেন, তারা নিজেরাই তা জানে না। কেবলি হাসি আসছে, হাসি পাচ্ছে। প্রাণ চাইছে, ভালো লাগছে।

তারপর দেখা গেল, তাদের গায়ে আঁচলের হাওয়া দিয়ে উরাতীয়া দুলে দুলে চলে গেল পুবের সড়কের পাশে ছোট্ট পুকুরটিতে। স্নান করে এসে, কাপড় পরে খুঁজে পেতে বার করল দুধের বালতি। গাইয়ের বাঁট দেখে সে টের পেয়েছে, সময় হয়েছে দুইবার। মরদগুলোর সে খেয়াল নেই। কোনদিন ছিল নাকি।

একটা নয়, ঘামারির গোরুরও দুধ দুইল সে। দুয়ে অবাক-মুগ্ধ মল্লবীর পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উনুন কোথায়? আগুন দেব।'

দুই বন্ধু বিস্ময়ে চোখাচোখি করল। চোখে চোখেই তাদের কথা। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালে তারা মনের ভাব বুঝতে পারে। মল্লক্ষেত্রে ওই শিক্ষাটি তারা আয়ত্ত করেছে। তাদের চোখ বোবা জানোয়ারের মতো বলাবলি করছিল, এসব কি হচ্ছে? সত্যিই কি আমাদের জীবনে একটা নতুন কিছু ঘটতে বসেছে? একটা কোন সর্বনাশ কিংবা সুখের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে? তবু তাদের মস্ত বুক দুটিতে একটা খুশির বন্যা পাক দিয়ে উঠছে।

ঘামারি বলল, 'তোর উনুনটা বার করে দে।'

লাখপতি বলল, 'কেন? তোরটা কি হল? তোরটাই দে।' বলেই আবার কি হল তাদের, তারা হেসে উঠল। এক নাম-না-জানা মদির রসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছে তাদের। একটা মাতলামির ঘোর লেগেছে মনে। শুধু তাদের মাঝে হাসি-উচ্ছল উরাতীয়ার গা বেয়ে যেন একটা মানুষিক মোহের ঝরনা পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

উনুন ধরল। ঘামারির ঘরে রান্না হত এতদিন দুজনের। এবার তিনজনের রান্না চাপল লাখপতির উঠোনে।

ঘামারি তেল আর ল্যাঙট নিয়ে এল। লাখপতির চাপা রক্তে লাগল ঢেউ। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মল্লক্ষেত্রে। একদিন শুধু মল্লযুদ্ধের জন্যে মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এতদিন শুধু নানান কায়দা ও চাপা হুংকার উঠেছে ভয়ংকর শক্তির ঘোরে। আর থমকে থেকেছে চারদিকের পরিবেশ। আজকের লড়াই উল্লসিত। আজ প্রাণখোলা উল্লাসের বান ডেকেছে মল্লক্ষেত্রে। রান্না চাপিয়ে থেকে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে উরাতীয়া।

কখনো বাঁকা হয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে ঘোমটা তুলে বা খুলে, চোখ বড় বড় করে, নয়তো খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে দেখছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসংকোচে দিয়ে উঠছে হাততালি।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছে, কার ক্ষমতা বেশী। আশ্চর্য! কেউ কাউকে আঁটতে পারছে না। ঘামারিকে ফেলে লাখপতি তার ঘাড়ে মাটি ফেলছে আর হাঁকাচ্ছে রদ্দা। তারপর বগলের তলায় হাত দিয়ে চেষ্টা করছে উল্টে ফেলতে। পারছে না। আবার পাল্টা লাখপতিকে নিয়ে চলল চেষ্টা। হল না।

তখন আবার হাসি। তিনজনের হাসি। এতদিন এই সন্ধ্যাবেলার উঁচু জমিটার উপরে, আকাশের কোলে দেখা যেত দুটি দানবের মূর্তি। আজ আর একটি বিচিত্র রূপের দ্যুতি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে। আজ তারাও যেন ধরেছে মানুষের মূর্তি। মানুষিক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে আজ এখানে।

তারপর দিন চলে গেল। একটা নতুন যুগের নব রূপায়ণের সূচনা ঘটল এখানে।

উরাতীয়া ছোট ঘরের মেয়ে ও বৌ. ক্রীতদাসী ছিল খুড়ী শাশুড়ীর ঘরে। নিষিদ্ধ যৌবনবাসর নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। যেমন ডাকত আরও অনেককে। যেতও অনেকে। সে প্রতীক্ষা করেছিল একজনের জন্যে।

এখানে এসে তার ছাব্বিশ বছরের পিপাসিত যৌবন প্লাবিত হল। সেই প্লাবনের ধারায় পলি পড়ল এখানকার মাটিতে, দুটি মল্লবীর মানুষের হৃদয়ে। সে একজনকে দিয়ে খুশি, পেয়ে খুশি আর একজনকে। লাখপতি তার ষোল আনা। জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার টায়টিকে হিসাবের পর যেটুকু মানুষকে করে নিঃশঙ্ক, বুকে

আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তার সহচর। তারা তার প্রেম ও প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, সুখ ও দুঃখ।
দেবতা ও সহচর, দুই মল্লবীরের মনে সে বোধ ছিল না। অবোধ খুশিতে রচিত হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা এতদিন শক্তি অনুভব করেছে মাংসপেশীতে। এবার হৃদয়ে হৃদয়ে। তাদের বিশাল শক্তিশালী শরীরের মধ্যে যে বন্দী বিহঙ্গটা এতদিন ছটফট করেছে, তা অকস্মাৎ মুক্ত হয়ে, ঝাঁপ দিয়ে স্নান করে নিল এক মুক্ত ফল্গুধারায়। জানত না, বন্দীর এ মুক্ত ফল্গুধারা হল উরাতীয়া।
এখন কুস্তির শেষে, যখন তারা দুজন দুধ সিদ্ধি খেয়ে হাওয়ায় বসে দোলে, তখন তাদের মাঝখানে এসে বসে উরাতীয়া। আগে তাদের মস্তিষ্ক থাকত অবসাদগ্রস্ত আর শরীরে বইত রক্ত। এখন মস্তিষ্কে একটা নতুন টংকার অনুভূত হয়।
উরাতীয়া বলে ঘামারিকে, 'তারপর, সে-কথাটা বল। তোমার বৌ কেমন করে মরল?'
মহাবীর, ভীম নয়, কুস্তি কায়দা নয়, বৌয়ের কথা। ঘামারি বলল, 'কি আবার বলব।'
লাখপতি বলে, 'বল না। আমি তো কোনদিন শুনিনি?'
উরাতীয়া ব্যথা পায়, অবাক হয়। বলে, 'সচ্! ওমা এত বন্ধুত্ব আর এ কথাটা কোনদিন বলা কওয়া হয়নি?' ঠোঁট ফুলিয়ে, অভিমান ভরে বলে উরাতীয়া, 'যাও! তোমরা যেন কি!'
বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। আর ওই কথা, ওই জলটুকু তাদের গলায় একটা বিস্মিত ব্যথা ও আনন্দের গোঙানি এনে দেয়। সত্যি, তারা অনেক কথা এতদিন বলেছে, হেসেছে। কিন্তু এমন বিচিত্র হাসি, ব্যথা ও আনন্দ, এত অজানিত সুখ দুঃখ, হৃদয়ের ছোট-

খাটো অসামান্য বিষয়ের আদানপ্রদান হয়নি।
অনেক কথা, অনেক হাসি, এমনকি কোন কোন রাতে মোটা ও হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান পর্যন্ত শোনা যায়:

ধোঁকে কে নিউ পর
ইমারত নেহি বনতে॥

অর্থাৎ, মিথ্যার ভিতে সত্য দাঁড়ায় না। এ গানটা লাখপতি শুনেছিল কোনকালে মাইনে আনতে গিয়ে জংসন স্টেশনে। হনুমানের কীর্তি গাথা নয়, হিড়িম্বা-বধের কাহিনী নয়, একেবারে অন্য কথা। তাও এতদিন পরে।
বেসুর ও হেঁড়ে গলার জন্যেও তাদের তিনজনের হাসির অন্ত ছিল না। কখনো ঘামারি সব উদ্ভট হাসির গল্প করে। ছেলেমানুষের মতো উৎকট অঙ্গভঙ্গি করে নাচে। কোন্‌কালে দেখা এক সিনেমার নায়ক-নায়িকার অভিনয় করে দুজনে দেখায় উরাতীয়াকে।
উরাতীয়া হেসে বাঁচে না। বলে, 'ছি ছি! দূর দূর!' তারপর আদুরে মেয়ের মতো বলে, 'আবার দেখাও না?'
আর দুই মল্লবীর তাই করে। পবনপোয়েরা যে এত সরল ও হাসি-উচ্ছল, তা জানত না গাঁয়ের মানুষেরা। রাক্ষসের মূর্তির মধ্যে মানুষের দেখা পেয়ে, তারাও যাওয়া আসা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের দশ বছরের ঘুনধরা রক্তে লুকিয়েছিল এক ভয়ংকর বিষধর। লুকিয়েছিল নিতান্ত দেহসাধক, সংসার ও ভালবাসাবিমুখ মল্ল-যোদ্ধাদের মনের অগোচরে। সুযোগ বুঝে সে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল।
এত সুখ, কথা ও হাসি। এত বন্ধুত্ব। তবুও মল্লযোদ্ধাদের কোথায়

চাপা ছিল আগুন, সে এবার থেকে থেকে জ্বলে জ্বলে উঠল আড় কটাক্ষে, শুধু চোখে চোখে। চোখে চোখে ভাব বিনিময়ে ছিল তারা দুরন্ত ও অভ্যস্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

যে মুক্ত ফল্গুধারায় স্নান করে তারা দু-দিন হেসেছিল অনর্গল, সে হাসি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওই মুক্ত ফল্গুধারাটা তাদের কাছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যৌবন ঝলকিত দেহ। মুক্ত আনন্দ, পাশব কামনার একটি যন্ত্র। দশ বছর ধরে তারা শুধু দেহের সেবা করেছে, দেহকে ভালবেসেছে। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তি বার বার তাদের ওইদিকে অঙ্গুলি সংকেত করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কবে ছিঁড়ে গেছে টেরও পায়নি। যে ভয়ংকর দৈহিক শক্তি তাদের মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত করল।

তারা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু একজনের চোখে, 'খবরদার! এদিকে নয়।' আর একজনের, 'নয় কেন?'

কিন্তু তারা লড়ে রোজ। খায় এক সঙ্গে, গল্প করে। তবু যেন জমে না। হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেরোয় গলা দিয়ে।

অবাক হয় উরাতীয়া। সব না বুঝলেও এটা বোঝে, অদৃশ্যে কী যেন ঘটছে। ওরা হঠাৎ এমন করছে কেন? জিজ্ঞেস করলে ওরা দুজনেই বোকার মতো হেসে ফেলে। আসর জমে উঠতে চায়। উঠতে পারে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিকতা আরও নিষ্ঠুর রূপে যেন ফুটে উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে উরাতীয়া। বোঝে না। বোঝে না, কেবল আড়ালে নিঃশব্দে কেঁদে মরে। ওরা আমার দেবতা ও সহচর। ওরা দু-দিন হাসল। কিন্তু আমি আসার আগেও কি ওরা এমনিই ছিল? মনে হয়নি তো? তবে।

ঘরের মধ্যে রাত্রে লাখপতির চেহারা বদলে যেতে লাগল। তার সোহাগ হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। আদর হয়ে উঠল ভয়ংকর। অসহ্য আদরে সোহাগে উরাভীয়ার দেহটার উপরে একটা ভয়ংকর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা যেন তার।

আর ঘামারি সেই সময়, অনেক রাত্রে ঢালু সড়কের পাশ থেকে উঠে আসে একটা ক্ষিপ্ত ভাল্লুকের মতো। দাঁড়িয়ে দেখে লাখপতির বন্ধ ঘরটার দিকে। যন্ত্রণা-কাতর জানোয়ারের মতো বুক থেকে ফেটে পড়া শব্দটাকে চেপে ধরে কণ্ঠনালিতে। কান পাতে দেয়ালে।

কোন শব্দ নেই। মাঘের উত্তরে হাওয়া তার গায়ে ও দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যায়।

শুকিয়ে উঠল উরাভীয়া। লাখপতিকে তার কিছু অদেয় ছিল না। ঘামারির একাকী জীবনের বেদনাই ছিল তার প্রীতি ও সৌহার্দ্যের গৌরব।

আড়ালে যদি সে জিজ্ঞেস করে লাখপতিকে, কি হয়েছে তোমাদের? লাখপতি শুধু চেয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উরাভীয়ার সর্বাঙ্গ, তারপর হঠাৎ খপ করে উরাভীয়াকে ধরে ভয়ংকর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে আদরে শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে। ঘামারি যেন তেমনি। জিজ্ঞেস করলে তেমনি করে চেয়ে থাকে। কিন্তু গায়ে হাত দেয় না। দিতে চায় যেন। উরাভীয়া ভয় পায়।

একই রকম দুজন। একই চাউনি ও চেহারা। কাছাকাছি থাকলেও এক এক সময় আলাদা করা যায় না ওদের। একই চালে ওরা দুজন চলেছে।

তবু ওরা লড়ে। শুধু লড়ে। তবে মহাবীরকে প্রণাম করে, হাত মেলায়, তারপর লড়ে। কিন্তু ওদের চোখে চোখ মিললেই, পাথরের

ঘর্ষণে যেন আগুন ঠিকরোয়। লড়তে লড়তে ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মুহুর্মুহুঃ নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যায়।
উরাতীয়া যেন কেমন করে বুঝতে পারে, লড়াইটা অন্যপথ ধরেছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝেছে। সে বাধা দেয়, থামতে বলে।
ওরা থামে। ছেড়ে আসে মল্লক্ষেত্র। কিন্তু ওদের ভেতরে দুটো জানোয়ার ফুঁসতে থাকে। উরাতীয়াকে মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে তারা শান্ত হতে থাকে।
কিন্তু এ অবস্থাও আর রইল না। হঠাৎ লাখপতি একদিন ঘামারির উনুনটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল।
ঘামারি বলল, 'ভাঙলি যে?'
লাখপতি জবাব দিল, 'ওটা পুরনো হয়ে গেছে।'
ঘামারি খেতে এল না। লাখপতি বলল, 'খাবিনে?'
ঘামারি জবাব দিল, 'না। তোদের রান্না আর ভালো লাগে না। নিজে রাঁধবো।'
আশ্চর্য শান্ত তাদের কথাবার্তা। বিকেলবেলা দুধ দুইতে গিয়ে উরাতীয়া দেখল ঘামারির গোরু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'গাই কোথায়?'
'মাঠে।'
'দুইতে হবে না?'
'না।' বলেই হঠাৎ ঘামারি দু-হাত বাড়িয়ে দিল উরাতীয়ার দিকে। এই প্রথম। উরাতীয়া দেখল রাত্রের বন্ধ ঘরের ক্ষিপ্ত স্বামী লাখপতি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন ছিল চাপা বেদনা ও অপমান। আজ তার চোখে দেখা দিল রাগ ও ঘৃণা। নিঃশব্দে পালিয়ে এল সে। নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

তারপর এপার ওপার হল। দুটো সংসার হল। কেবল দেখা হয় মল্লক্ষেত্রে। এসে দেখে উরাতীয়া। বসে হাসে, কথা বলে কিন্তু একটা রুদ্ধশ্বাস গুমরানি নিয়ে নেমে আসে আকাশটা।

লড়াইয়ের শেষে উরাতীয়া দেয় দুধ আর সিদ্ধি। ওরা খায়।

হয়তো লাখপতি বলে, 'হিড়িম্বাকে কি ভাবে মেরেছিল ভীম ?'

ঘামারি বলে, 'টুঁটি ছিঁড়ে।'

উরাতীয়া কেঁপে উঠে বলে, 'ওসব কথা থাক।' শঙ্কিত অথচ আদুরে গলায় বলে, 'গান গাও তোমরা একটু আমি শুনি।'

গান! বিদ্রূপের মতো শোনায় যেন কথাটা। আর উরাতীয়ার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে।

কিন্তু জগৎবিমুখ দেহাশ্রিত এই মল্লযোদ্ধাদের বুকে জেগেছে যে অজগর, তা ফুঁসছে দিবানিশি।

মুক্ত ফল্গুধারা স্নান করেই শেষ হয়েছে। মুক্তিটাকে দেহের মতো লুফে নিতে চাইছে তারা।

শীত গেছে। বসন্ত এসেছে। রাত এসেছে। ঢালু সড়কে ধুলো উড়ছে। গাছগুলি পাগল হয়েছে।

সেদিন শেষ গাড়িটা যায়নি তখনো। লড়াই শেষ করে বসেছে দুজন। পরস্পরকে বারবার আক্রমণ করেছে তারা। এমন কি, আইনভঙ্গ করে আঘাত করেছে। যে জন্যে ঘামারির কপালটা উঠেছে ফুলে আর লাখপতির ঠোঁটের কষে রক্ত।

উরাতীয়া নিয়ে এল দুধ সিদ্ধি। বুক ফেটে যাচ্ছে এই দুই বন্ধুর লড়াই দেখে। তারই জন্যে ওরা আজ পরস্পরকে ঘৃণা করছে, লড়ছে। কিন্তু কেন, কেন ? সে ওদের বুক ভরে নিয়েছে, ওরা কেন পারছে না। তবু সে হাসতে চাইল, আর চোখ ফেটে এল জল। 'ভগবান। ওরা

মানুষ চেনে না, ভালবাসে না, হাসে না। আমি হাসতে হাসতে এলাম, ওরাও দু-দিন হাসল। তারপরে এই যন্ত্রণা। সে কি শুধু আমি? তবে ক্রীতদাসী আমি ছিলাম ভালো।'

দুধের পাত্র এগিয়ে দিল সে লাখপতির দিকে। কিন্তু, চকিতে কি ঘটে গেল, গেলাসটা নিয়ে লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লাখপতি। মুহূর্তে কিসের এক সংকেত, দুই মল্লযোদ্ধাই চকিতে উঠে দাঁড়াল। পরস্পরকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দুজনেই, দু-দিক থেকে গিয়ে দাঁড়াল মল্লক্ষেত্রে।

উরাতীয়া ব্যাকুল গলায় বলল, 'আর না, আর লড়ো না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা আচমকা রদ্দা মেরে ঘামারিকে ছিটকে ফেলেছে লাখপতি। কিন্তু চকিতে ঘামারি লাফ দিয়ে উঠেছে। তারপর পরস্পর ঝুঁকে পড়ে কয়েকবার নিঃশব্দে পাক গেল চারপাশে। অন্ধকারেও তাদের জ্বলন্ত চোখ দেখছিল পরস্পরকে।

উরাতীয়া ছুটে এল মল্লক্ষেত্রের মাঝখানে, 'পায়ে পড়ি, ওগো পায়ে পড়ি, থামো।'

কিন্তু তাকে এড়িয়ে বনবেড়ালের মতো নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঘামারি লাখপতির পা দুটো ধরে, তাকে নিয়ে সশব্দে পড়ল মাটিতে। আর তাদের দেহের ধাক্কায় লাইনের তারের কাছে ছিটকে গেল উরাতীয়া। চিৎকার করে উঠল, 'থামো!'

থামবে না। প্রাগৈতিহাসিক সেই জানোয়ার দুটো আজ ইতিহাসের যুগকে ত্বরান্বিত করার জন্যে নিজেদের বোধ হয় শেষ করবে। দেখা গেল, লাখপতির পা ধরে পাক দিচ্ছে ঘামারি, শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু লাখপতি আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, দুজনেই জাপটা জাপটি করে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হুংকার ছাড়ছে,

পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর দেখা গেল, এক-জনকে চিত করে ফেলে গলা টিপে ধরেছে একজন, আর একজন দু-পায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে গর্দান। আর একটা ভয়ংকর গোঙানি। দূর থেকে একটা আলো এসে পড়েছে মল্লক্ষেত্রে। কিন্তু আমৃত্যু এই হিংস্র লড়াই। সেই আলোয় উরাতীয়া দেখল, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে পাথরের গায়ে।

আলোটা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। শেষ গাড়িটা আসছে। উরাতীয়া মরিয়া হয়ে ওদের দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার নরম হাতে আঘাত করল, চিৎকার করে উঠল, 'থামো, থামো বলছি।'

কিন্তু তাদের পরস্পরের পেষণে শুধু তীব্র গোঙানি। ছিটকে যাচ্ছে মাটি, খাদ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্ষেত্র।

উরাতীয়া অস্থির অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়াল। মরবে, হয়তো দুজনেই মরবে তার চোখের সামনে। শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না।

এই ভয়ংকর দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে সে অপলকদীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে-আসা আলোর দিকে। অসহ্য ঘৃণায়, অপমানে, বেদনায় ও অভিমানে অভিশাপ দিতে চাইল সে। দিতে গিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল। আর একবার ওদের দিকে দেখে, চোখে হাত দিল। গাড়ির শব্দটা কানের কাছে বেজে উঠে মাটি কাঁপিয়ে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লাইনের উপর।

তারপর একটা তীব্র চিৎকার, এঞ্জিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটা নিয়ে সে আবার ছিটকে পড়ল মল্লক্ষেত্রের সামনে। গাড়িটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল পেছনের রক্তক্রুদ্ধ চোখের মতো লাল আলোটা।

হয়তো উরাতীয়ার মৃত্যু-চিৎকারটা তাদের পাশবিক মল্লযুদ্ধের চেয়েও

তীব্র ও ভীষণ জোরে বেজে উঠেছিল। হঠাৎ মল্লযোদ্ধাদের দুজনেরই হাত শিথিল হয়ে এল। দুজনেই তারা ছেড়ে দিল পরস্পরকে। দুজনেই উঠল, দুজনেই ফিরে তাকাল উরাতীয়ার শরীরটার দিকে। মুহূর্তে চমকে, দুজনেই টলতে টলতে এসে বসল উরাতীয়ার দু-পাশে। তাদের মতো ভয়ংকর মানুষরাও দারুণ আতঙ্কে যেন শিউরে ডুকরে উঠল।

কে লাখপতি, কে ঘামারি, আর তাদের চেনা যায় না। তারা এক রকম দেখতে, একই তাদের কণ্ঠস্বর। একজনেই দুজন।

একজন যেন দূর থেকে চাপা গলায় ডাকল, 'উরাতীয়া!'

অন্ধকারে চকচক করছে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গের রক্ত। সে নিঃশব্দ, নীরব। সে মারা গেছে।

আর একজন ডাকল, 'উরাতীয়া!'

কোন শব্দ নেই। তারা আবার দেখল পরস্পরকে, আবার উরাতীয়াকে। তারপর ভূমিকম্পের নাড়া খাওয়া পাথরের মতো কেঁপে উঠল তাদের বিশাল শরীর দুটো। বোবা করুণ অসহায় জীবের মতো কাঁপতে লাগল। আর রক্তের ও চোখের জলের নোনা স্বাদে ভরে উঠতে লাগল মুখ। তারা আবার ডাকতে চাইল, উরাতীয়া! কিন্তু পারল না। শুধু বুকে বাজতে লাগল, উরাতীয়া! উরাতীয়া!

একদিন তারা দেহাশ্রিত বদ্ধ জীবনবোধে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। তারপর মুক্তি এসেছিল, তারা হেসেছিল, গান করেছিল, তাদের ঘাম ঝরেছিল একদিন। আজ রক্ত পড়ল, চোখের জলে ভিজল মাটি।

শুধু নিথর হয়ে পড়ে রইল সেই মেয়ে উরাতীয়া। বুকে বাজল তার নাম। বাজতে লাগল, বাজতে থাকবে হয়তো চিরদিন, যতদিন না সে আবার এসে হাসবে, কথা বলবে। নামটা তেমনি বাজতে লাগল আর দূর দক্ষিণের পাগল হাওয়া ছুটে এল হা হা করে।

কিম্‌লিস
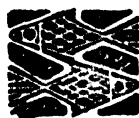
সন্ধ্যা হয় হয়, তবু হয়নি। এখনো আকাশ ভরে নামেনি তার কালো ছায়া। পশ্চিম দিকের রাবিশ ও ঘেঁষ ফেলা চওড়া সড়কটার মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, গঙ্গার স্বচ্ছ জলে পড়েছে পড়ন্ত বেলার আকাশের ছায়া। আকাশেরই ছায়া, কারণ সূর্য ডুবে গিয়েছে। নির্মেঘ আকাশের কোলে গাঢ় লালিমা। ওপারের কারখানাটার পেছনে এই মাত্র ডুবেছে সূর্য। আকাশের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে গঙ্গাকে দেখাচ্ছে যেন তাতানো ইস্পাতের মতো। ঢালাই ইস্পাতের জুড়িয়ে আসার মতো গঙ্গার পুব কোল জুড়ে নীলচে ঝিলিক দিচ্ছে।

শীতকাল। মাঘ মাস। জনশূন্য গঙ্গার ধার। দু-চারটে নৌকো মন্থর গতিতে উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে চলেছে। জেলে নৌকো নয়, ব্যবসায়ী। সড়কটার ডান পাশ জুড়ে একটা সুদীর্ঘ বস্তি। ছিটে বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ। মাথায় খোলা ছাওয়া। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায়, সমস্ত বস্তিটা পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়েছে। যেন হেলান দিয়ে রয়েছে। বস্তিটার সামনে কতগুলি ছেলেমেয়ে খেলা করছে ন্যাংটো হয়ে খালি গায়ে। ওদের শীত নেই।

এমন সময় সে এসে দাঁড়াল বস্তিটার সামনে। তার আপাদমস্তক দেখে মনে হয়, এ বস্তির বাসিন্দা সে কখনোই নয়। তার মাথার চুল হাল আমলের ছোকরাদের মতো মাপজোখ করে ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামানো পরিষ্কার মুখ। রংটা অবশ্য কালো। গায়ে শার্টের উপর উলের সোয়েটার, সাদা জিনের ফুল প্যাণ্ট। পায়ে ইংলিশ বুট। এক

হাতে একটা চামড়ার স্যুটকেশ ও আর এক হাতে বেডিং।

চেহারাটাও তার দেখতে শুনতে নেহাৎ মন্দ নয়। নাকটা একটু মোটা, আর ঠোঁট দুটো একটু পুরু। তার সেই ঠোঁট চাপা হাসিতে ছুঁচলো হয়ে উঠেছে, আর নাকটা কুঁচকে গিয়ে ফুটো দুটো দেখাচ্ছে একটু বড় বড়।

বাইরের আলো নেই বস্তিতে। সেখানে ইতিমধ্যেই সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে। ঘরে ঘরে জ্বলছে উনুন। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে বস্তির ভেতরটা। উঠানের উপরে কেউ কেউ কাপড় কাচছে, দু-একটি ঝি বহুড়ি জল তুলে এনে স্নান করতে বসেছে। তারই কাছাকাছি খাটিয়াতে বসেছে পুরুষদের বৈঠক। সারাদিনের পর এসময়েই তাদের যত কথা গান হাসি ঝগড়া। ছুটির পর ছাড়া সময়ই বা কোথায়!

সে ভেতরে এসে সবাইকে একবার খুব গম্ভীরভাবে ভাবিক্কী হাসিতে ঘাড় নেড়ে সোজা গটগট করে এসে দাঁড়াল পুবদিকে বানোয়ারীর ঘরের কাছে।

বুড়ো বানোয়ারী আর তার বৌ রামদেই তখন সবেমাত্র কারখানা থেকে এসে পা ছড়িয়ে বসেছে ঘরের দাওয়ায়। তাদের ঘিরে বসেছে একপাল অপোগণ্ড, তাদেরই ছেলেমেয়ে।

অদূরেই উনুনে আগুন দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে একটি ষোল-সতের বছরের বৌ। তার অযত্নের জটধরা পিঙ্গলবর্ণের খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে, ধোঁয়া লেগে চোখে এসেছে জল।

এদের সঙ্গে বস্তির প্রায় সকলেই এই ফিটফাট পাতলুন-পরা আগন্তুকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বানোয়ারী বেচারী তো কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বার দুয়েক কপালেই হাত ঠেকিয়ে ফেলল। তার গোঁফের ফাঁকে সংশয়ের হাসি। একে অপরিচিত, তায় রীতিমত

বাবু। সংশয়ের মধ্যে তার ভয়ও ধরেছিল।

রামদেইয়ের অবস্থাও তাই। বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে বৌটি একেবারে উনুনের ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার কোণে গিয়ে ঢুকেছে। হায় রাম! এ আবার কে?

আগন্তুকের গাম্ভীর্য আর টিঁকল না। তার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল বড় বড় উঁচু দাঁতের সারি। কোন কথা না বলে হাতের বোঝা দুটো নামিয়ে ফেলে, ঘাড়টা একটু তুলে, হাত দুটো ঝাড়তে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার মতো বস্তির মেয়ে পুরুষ দূরে দূরে ঘিরে দাঁড়িয়ে রীতিমত একটা ব্যূহ তৈরি করে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল বস্তিতে। এমন কি বাচ্চা-গুলিও চিৎকার করতে ভুলে গেল।

বানোয়ারী হাত জোড় করে আর না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আপ—' এবার সে হা হা হি হি নানান বিচিত্র স্বরে দরাজ গলায় হেসে উঠল। বুকে হাত দিয়ে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় বলল, 'আরে হাম, হম বেচন, তুমহারা লেড়কা।'

বেচন! বানোয়ারীর ছেলে বেচন! অমনি ছায়ারা সব মূর্তি ধরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেচনের গায়ের উপর। একটা স্বস্তির নিশ্বাস সকলের পড়ি পড়ি করেও পড়তে চায় না। ইচ্ছেটা, গায়ের চামড়া খুঁটিয়ে না দেখা পর্যন্ত যেন বিশ্বাস নেই। চটকলের স্পিনার, গোরক্ষপুরের কাহারের ব্যাটা, নিজের নাম বলতে বাপের নাম বলে, সেই হাবাগোবা বেচন এটা?

এ বলে, হায় রাম! ও বলে, হে ভগবান! সে বলে, কাঁহা যাই?

বেচনের মা রামদেই তো এক মুহূর্ত হাঁ করে দেখেই, বেড়ায় মুখ গুঁজে ডুকরে উঠল, 'ই হামার কা ভইল্ হো!'

উনুনের পাশে বেড়ার কোণে বৌটির বুকের মধ্যে ভয়ে ধুক ধুক করছে। সেই পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। তারপর দেড় বছর আগে গাওনা করে বেচন আর তার শ্বশুর তাকে মুলুক থেকে নিয়ে এসেছে। বেচন তার কাছে ছিল মাত্র দেড় মাসের মতো। তার পরেই চলে গিয়েছিল। সেই বেচনের একটা মূর্তি এঁকে রেখেছিল সে। কিন্তু আজ একি সর্বনাশ হল তার। এ কোন্ দেশী আজব মরদ। এ তো তার সে মানুষটা নয়।

প্রথমে সে ফুঁপিয়ে উঠে একেবারে শাশুড়ীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল।

বেচন পড়ল মুশ্‌কিলে। খানিকটা অপ্রতিভের হাসি হেসে সে বলতে গেল, 'আরে তুমলোগ রোতা কেঁউ?' কিন্তু তার আগেই বানোয়ারী চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে শুয়ার কা বাচ্চা, ইয়ে হম্ কেয়া দেখতা? তু কেয়া জেহেলসে আতা?'

বেচনের হাসি ততক্ষণে উবে গেছে। তবু যথেষ্ট সপ্রতিভভাবে বলল, 'হাই লাও, গালি বকতা। জেহেলসে আতা নহি তো কেয়া ময়দান সে আতা!'

'চোপ! চোপ রহো হারামজাদা।'

চিৎকার করে বানোয়ারী মারতে আসে আর কি। এখন সে রীতি-মত বাঘা বাপ। বাঘা বাঘের মতোই ব্যাটাকে শাসন করতে উদ্যত। বেচনের জামা কাপড় দেখিয়ে বলল, 'আরে তু তো বানোয়ারী কাহার কা লেড়কা, কাঁহাসে সাহাব বন্‌কে আয়া, অাঁ? লিখাপঢ়ি নহি জানত, আরে গোরক্ষপুরকা চুহা, চুতিয়া বানোয়ারী নন্দন, ইসব তু বদন পর ক্যায়া চঢ়ায়া, অাঁ? কাঁহাসে চোরায়া?'

চোরায়া? চুরি? বেচন হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। একটু

হাসি হাসি, একটু বোকা বোকা, করুণ চোখে তাকিয়ে, হতাশা ভরে সে বলল, 'হাই লাও, চোরি হম্ কাহে করেগা?'
সেই জবাবের আগেই ভিড় ঠেলে অনন্ত এসে বলল বানোয়ারীকে, 'বানোয়ারী, তুমকো জল্‌দি বাড়িওয়ালা বোলাতা।'
বানোয়ারী তৎক্ষণাৎ ভিড় ঠেলে চলে গেল। বাড়িওয়ালা শুধু বাড়িওয়ালাই নয়, একটা ডিপার্টের সর্দার, দেশ গাঁয়ের ব্রাহ্মণ, একটা মোড়ল গোছের লোক। তার উপরে, সুদ কিস্তিবন্দীর কারবারী, ধার দেনা দেয়। অর্থাৎ দোষ, বিচার, জান-প্রাণ, সব তার হাতে। সব ফেলে আগে তার কথা শুনতে যেতেই হয়।
বেচন আর কি করে। তার এত সাধের সাজগোজ, প্রাণে ঠাসা এত আজব অবাক কথা, সর্বোপরি নিজেকে একটা মানুষের মতো মানুষ বলে জাহির করা, সব তো বেঘাটে গেলই উপরন্তু আর একটা সোরগোলের সূত্রপাত হল বস্তি জুড়ে।
তখনো সবাই তাকে ঘিরে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়োর দল। দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কথা বলছে নানারকম। আর ওদিকে মড়া কান্না জুড়েছে মা আর বৌ, ভাই আর বোন।
বেচন জেলে গিয়েছিল। দেড় বছর ধরে জেলে ছিল সে। না, চুরি বাটপাড়ি করে যায়নি, কারখানার রেশন হরতালে, যাকে বলে সে একেবারে দলপতি হয়ে উঠেছিল। কম আর খারাপ রেশন, অতিরিক্ত দাম, কোম্পানী তাও বন্ধ করে দেওয়ার ফিকিরে ছিল। আর দশজনের সঙ্গে বেচনও এ অবিচারটা সহ্য করতে পারেনি। সে ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল। এমন কি তার এই বাপ, ঘিরে-ধরা এই সব পাড়াপ্রতিবেশীরা বেচনের কথায় একেবারে হল্লায় মাতিয়ে তুলেছিল কারখানা, ঘেরাও করেছিল ম্যানেজার

সাহেবকে। সারা এলাকা জুড়ে যে হরতাল কমিটি হয়েছিল, বেচন সেই কমিটির মেম্বর পর্যন্ত হয়েছিল। একটা যা-তা কথা নয়।
হ্যাঁ, নিজের প্রাণের কাছে তো আর সত্যি কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। কোত্থেকে তার প্রাণে এত তেজ ও ঘৃণা জন্মেছিল সে কিছুতেই ঠাওরাতে পারেনি। কিন্তু শুধু পদাধিকার নয়, কারখানার সকলের মুখে মুখে খালি বেচন, এমন কি লেবার অফিসার ও ম্যানেজারের মুখেও বেচন নামটা শুনে, তার প্রতি সকলের নজর দেখে গোপনে গোপনে সে এক রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল। নিজের জানটাই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। হয় এসপার নয় ওসপার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেচন বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়েছিল। বাপ অবশ্য কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল তার সঙ্গে। মাও তাই। বহু, মানে বৌ তো তখনো বাপের ঘর থেকে গাওনা শেষ করে এখানে আসেইনি।
তাদের দাবি তো মঞ্জুর হল, কিন্তু সেই দিনই ম্যানেজার তাকে ডেকে পাঠাল কথা বলার জন্যে। কথা বলতে গিয়ে, যাকে বলে 'বাকডোর' দিয়ে দারোগা সাহেব তাকে থানায় নিয়ে যাবার নাম করে একদম কলকাতা চালান করে দিল। বোঝো ব্যাপারটা! সে জিজ্ঞেস করেছিল দারোগা বাবুকে, 'বাবু আপ্ হম্‌কো কাঁহা লিয়ে যাচ্ছেন?'
দারোগাবাবু তার দিকে চেয়ে, মুখে সিগারেট নিয়ে, হেসে বলেছিল, 'আস্‌লি কারখানামে, যাঁহা পুরা রেশন মিলবে, আর পুরা হরতাল কমিটি হাজির আছে।'
দারোগাবাবুর প্রতি একবার অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল, সেজন্যে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু জেলে গিয়ে সে দেখল, সত্যি, একজন বাদে, পুরো হরতাল কমিটিই হাজির হয়ে গেছে। দেখে সে গম্ভীর হয়ে তাদের বলেছিল, 'তুমলোগ আয়া ইয়ে হম্ পহ্‌লেসেই জানতা।'

আর সেখানে সে কি ছিল? না, রাজবন্দী। মানে? মানে 'ডেটিউন্।

কথাটা মনে হতেই সে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তার অপ্রতিভতা ছেড়ে। শার্টের কলারটা ঠিক করে নিল, বার দুয়েক প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বেশ সৌজন্য সহকারে, 'কেয়া তুমলোগ সব আচ্ছা হ্যায় তো?'

কেউ হাসল, কেউ কৌতুকে ও সংশয়ে চুপ করে রইলো। কেবল একজন অল্পবয়সী ছোক্‌রা, বেচনেরই সমবয়সী বলল, 'হাঁ আচ্ছা-ই হ্যায়। ভাই বেচন পুলিস তুমকো বহুত মার মারা?'

মার? অবিকল একটা শরীফ আদমির মতো হেসে ফেলল বেচন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, চেষ্টা করেছিল বৈকি। আজে-বাজে নানা রকম প্রশ্ন করেছিল ওকে—এই বাবু কোথায় থাকে? ঐ বাবু কবে এসেছে? বোমা কোথায় তৈরি হয়। একেবারে আজে-বাজে প্রশ্ন সব। তা ও আর কি বলবে? বলল, ও কিছুই জানে না। এতে ভয় দেখাল ওরা, বলল, জান নিকেশ করে দেবে। তা ও আর কী করতে পারে বলো?

বলতে বলতে তার গলার স্বর এক পর্দা চড়ে গেল। বাদবাকি সকলের চোখগুলি বড় হয়ে উঠল। আধা অন্ধকারে একদল কালো কালো লোক ভূতের মতো ঔৎসুক্যে বিস্ময়ে জ্বল জ্বল করতে লাগল। এমন কি রামদেই ও বৌয়ের কান্নার স্বরটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বেচন বলল, 'বোলা জানসে মার ডালো। যো হম্ নহি জান্‌তা ও কেয়সে বাতায়েগা? বোল্‌কর হম্ একদম চুপ হো গয়া। উস্‌কে বাদ হম্‌হারা ফটো খিঁচা, টিপ্ সহি লিয়া ঔর ভেজ দিয়া জেহেলমে।' তার চোখে ফুটে উঠলো হৃদয়ের চাপা বীরত্ব। আর সকলে তাদের

বেচনেরই এই অভাবিতপূর্ব দুঃসাহসিক কাহিনী শুনে কয়েক মুহূর্ত থ মেরে রইলো। ব্যাপারটা যদি তেমন কোন বাঙালী বাবুর হত, কিংবা বাবু সাহেবদের কোন দিগ্‌গজ ছেলের হত তা হলে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। এ তো তাদের বানোয়ারীর ব্যাটা বেচন কিনা!

বেচনের এবার আর এক মূর্তি। গভীরভাবে একটু ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল কারখানার হাল চাল কি রকম।

সেই ছোক্‌রা দোস্ত বলল, 'হাল চাল? শালা রোজানা খিচ্‌খিচ্‌। ইস্‌কে লিয়ে ছাঁটাই, উস্‌কে লিয়ে চারসীট্‌, বোনিং। ইয়ে তো রোজানা হোতা।'

হাঁ? বেচন বুক ফুলিয়ে জ্বলন্ত চোখে সকলকে একবার দেখে রীতিমত বক্তৃতার ঢঙে বলতে আরম্ভ করল, 'হম্‌ কালহি কারখানা যায়েগা। দেখো ভাই, জিসকো বোলতা মজদুর তুম্‌ ওহি হ্যায়। তুম্‌কো সব একাই রহেগা, একসাথ লড়েগা তো কোম্পানী কা—'

থামতে হল, স্বয়ং সর্দার বাড়িওয়ালা হাজির তার বাপের সঙ্গে। একজন একটা খাটিয়া এগিয়ে দিল। তিনি বসলেন। গোঁফের ফাঁকে বিরক্তি ও হাসি। মোটা ভ্রূর তলায় সংশয়ান্বিত অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বেচনের দিকে।

সকলেই আবার চুপচাপ। যেন পঞ্চায়েত বসেছে। কাঠগড়ার বন্দীর মতো এতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বেচন। বিচিত্র মানুষের মতো দাঁড়াল সে। তারপর স্তব্ধতা ভেঙে, সে-ই প্রথম বলে উঠল, 'নমস্তে বাবু সাহেব।'

নমস্তে! হুঁ! আর রাম রাম নয়। মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ল সর্দার বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ। অর্থাৎ ছোঁড়ার রোগ ধরেছে ভালো জায়গায়, এটাই বুঝল।

প্রচণ্ড শীত। তবু কেউ ঘরে যাচ্ছে না ভিড় ছেড়ে। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের দীপ্তিহীন তারাগুলি আন্ধিকালের ছানিপড়া বুড়োর চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে যেন। উঠোনের উপর নিম গাছটার পাতা নেই। এই ঘিরেধরা মানুষগুলির মধ্যে মনে হচ্ছে সেও এদের একজন।

ঘরে ঘরে কাজকর্ম একরকম বন্ধই। তবুও পিদিম লম্ফ জ্বলেছে ঘরে ঘরে। অবুঝ উৎসাহী বাচ্চারা আলোচনাটা নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছে। অন্যান্যেরা একবার দেখছে কালিকাপ্রসাদকে আর একবার বেচনকে। কালিকাপ্রসাদ বলল, 'বেচন, বেটা, তুই জেহেলসে আতা?'

বেচনের বোধ হয় কালিকাপ্রসাদের উপর মনটা একটু বিরূপ। নয় তো এতক্ষণে সে সত্যি খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। জবাব দিল, 'জরুর। হম কেয়া ঝুট বোলতা?'

জবাবের ধরন দেখে বানোয়ারীর হাত নিসপিস করে উঠল। কালিকা প্রসাদ কিন্তু মোলায়েম গলায় বলল, 'নহি নহি ও বাত নহি। তো ইয়ে সব বঢ়িয়া চীজ তুঝে জেহেলসে দিয়া?'

'নহি তো হম্ চোরি কিয়া?' বলে বেচন সাক্ষী মানতে গেল সবাইকে। অন্য সবাই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে।

বানোয়ারী যথেষ্ট শান্তভাবেই ধমকে উঠল, 'চোপ, বাবুসাহাব যো পুছ্ তা ঠিকসে জবাব দো। তু জেহেল কোম্পানীকা লেড়কা নহি, হমকো। হাঁ! এহি বানোয়ারীকো, হাঁ।'

সেসব দিকে বেচনের কোনই খেয়াল নেই। সে ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছে এক অপূর্ব দীপ্তি। তাতে মনে হচ্ছে,

সে যেন ভীষণ রেগে উঠেছে। সে বোঝাতে আরম্ভ করল, সে কি ছিল। জেলে সে কিভাবে থাকতো, কি খেত। সরকার তাদের কি দিত। তারপরে সে আরও জোরে গলা চড়িয়ে বলল, 'মগর কাহে ? না, হম ডেটিউন লোগ ফায়েট কিয়া। হাঁ, ফায়েট, ঔর চালিশ রোজ সিরিফ ভুখা রাহা।'

ভুখা ? চল্লিশ দিন ! বানোয়ারীর ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। রাগে খাড়া হয়ে উঠল তার পাশুটে গোঁফ জোড়া। চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপ্ হারামজাদ, ফির ঝুটা বাতয়েগা তো জুতি সে মু তোড় দেগা।'

সে চেঁচানিতে বেচনের হাত পা শক্ত হয়ে উঠল। সাবধানের মার নেই। তবু সে হাত তুলে বোঝাতে গেল। কিন্তু তার আগেই বানোয়ারী সবাইকে সাক্ষী মেনে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ভাই, শুনিয়ে বাবুসাহাব, হম সাত রোজ ভুখ তথ্‌লিফ সে সব ছোড়কর ভাগ আয়া বাঙ্গালমে, ঔর ইয়ে লেড়কা চালিশ রোজ ভুখা রাহা ওহি পাত্‌লুন কা খাতির ?'

জিভ্ দিয়ে একটা অধৈর্যের ও বিরক্তির শব্দ করে বেচন বাপের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'হাই লাও—'

বাধা দিতে বানোয়ারীও রেগে উঠল, 'হাই লাও কেয়া রে শালা ?'

বেচন এবার পালিশ করা মুখ বিকৃত করে, রীতিমত বেঁকে কোমরে হাত দিয়ে বলল, 'তুম আপ্‌না লেড়কাকো শালা বোলতে হো ?'

বোধ হয় অপরিসীম বিস্ময়ের ঝোঁকেই একমুহূর্ত কথাই বেরুল না বানোয়ারীর মুখ দিয়ে। খালি গোঁফ জোড়া কাঁপতে লাগল। তারপর চতুর্গুণ জোরে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়ে কেয়া আজ নয়া বোলতা, আঁ ? তু যব দুনিয়া নহি দেখা তব সে বোলতা, ঔর

আজ তু হমকো সমঝানে আয়া ?'
বলে কালিকাপ্রসাদের দিকে ফিরে বলল, 'বাবুসাহাব, ইসকো হম্ খুন করেঙ্গে আজ।'
কিন্তু খুনোখুনি সম্ভব হল না। কেননা বানোয়ারীর ততখানি অগ্রসর হওয়ায় সাহস ছিল না। সে যতটা এগিয়েছিল, ততটা পেছিয়ে এল। হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে।
কালিকাপ্রসাদ এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল বেচনকে, মনযোগ দিয়ে শুনছিল তার কথা। এবার সে স্থির বিশ্বাসে, গোঁফ মুচড়ে বলল, 'বেচন তু কিম্‌লিস বনকর আয়া, কেঁও ঠিক হ্যায় না ?'
এই অভূতপুর্ব প্রশ্নে সকলেই উৎসুক চোখে তাকাল বেচনের দিকে, তার জবাবের প্রত্যাশায়। কথাটার সঠিক অর্থ সকলে জানে না আর সুখের হোক দুঃখের হোক, অনেকে শোনেওনি।
প্রথমটা একটু বেকুব হয়ে গেল বেচন। তার চাঁছা-ছোলা মুখটা আর দশটা মুখের মধ্যে মিশে গেল যেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই পুরু ঠোঁটের ফাঁকে তার ঝকঝকে বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়ল, 'ও কিম্‌লিস্, মানে জিস্‌কো বোলতা কাম্‌নিস্, ঠিক হ্যায় না ? উয়ো তো ভারি ক্রান্তিকারী লোগ কাম্‌নিস্ হোতা ? মগর...'
বলে সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বোধহয় তার জেল জীবনের কথাগুলি একবার গুছিয়ে নিল মনের মধ্যে। তারপর বলল, 'এক বাত, টাইম যব আ যায়েগা ক্রান্তিকারী সব তো যায়েগা একদম ঠিকসে তব্ কামনিস্ বন যায়েগা। হাঁ, কোই রোজ বন্ যায়েগা।'
কথাটা সে এমনভাবে বলল, যেন খুব একটা গর্বের ব্যাপার এবং সে জন্যে জীবনে অনেক কাঠখড় পোড়াবার দরকার আছে। বলা বাহুল্য, কালিকাপ্রসাদ তার কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করল না।

একে তো বেচন কারখানায় হরতাল করিয়ে দিয়েছিল। তারপর দেড়বছর জেল খেটে এল, চল্লিশ দিন না খেয়ে ছিল, তার উপর ছোকরার চেহারাই বদলে গিয়েছে। এমন কি কথার ধরনও। সুতরাং ও নিশ্চয়ই কিম্‌লিস্ হয়ে গেছে, কিন্তু গোপন করছে। কালিকাপ্রসাদ ভাবল, ঠিক আছে, আমিও কালিকাপ্রসাদ সর্দার। ওকে আমি ঠিক শায়েস্তা করব। তবে বস্তির লোকদের একটু সামলে রাখতে হবে আর ম্যানেজারকে খবরটা দিয়ে দিতে হবে। বেগতিক দেখলে ভাগাতে কতক্ষণ। সে বানোয়ারীকে ডেকে নিয়ে আড়ালে বলে দিল, 'খুব হুঁশিয়ার, তুমহারা লেডকা বহুত ভারি কিম্‌লিস্ বন কর আয়া। উসপর নজর রাখ্‌না হোগা, কিম্‌লিস্ পার্টি উস্‌কো ছোড়ানে হোগা, সমঝা? নহি তো, বেমারি বাঢ় যায়েগা!'

যাই হোক, বানোয়ারী মোদ্দা বুঝল যে, তার ছেলে চুরি করেনি এবং ভগবানই জানে জেলে ওকে কি তুক্ করেছিল যে, চল্লিশ দিন ও না খেয়েছিল সত্যি। অবশ্য পুরো বিশ্বাস সে কোনদিনই করতে পারবে না। আর একটা ঘোড়ারোগ নিয়ে এসেছে হারামজাদা, অর্থাৎ কিমলিস হয়ে এসেছে। কালিকাপ্রসাদ তাকে এও বুঝিয়েছে, লাল ঝাণ্ডা শিউপুজনবাবুর আছে, কাম্‌তাপ্রসাদ শেঠের আছে, নওরিন-বাবুরও আছে, কিন্তু কিমলিস্ এক আলাদা জিনিস। মুসলিম কিরিস্তান তো মানেই না, বোমা গুলি-গোলা সর্বদা ওদের পকেটে পকেটে ঘোরে।

অতএব, বানোয়ারী বুঝেছে, তার ব্যাটা এক ভয়াবহ জীব।

নগিনা মুচির ছেলে পাতলুন পরে, টেরি বাগায়, কিন্তু আসলে সেটা সিঁদেল চোর। ওকে পুলিস উঠতে বসতে লাথি মারে। বছরে এক মাস বাইরে থাকে। রাজিন্দরের ব্যাটাও ফুটানি করে, আসলে গুণ্ডামী

ওর পেশা। আর বেচন, কিমলিস্। হায় রাম!

কিন্তু তবু সে আসল কথাটা চিৎকার করে জানিয়ে দিল, 'যো ভি হো, হপ্তা মে হমকো দশ রুপেয়া দেনে হোগা, ফোকটমে খানা নহি মিলে গা, এ পহ্‌লেহি বোল্ দেতা।'

বেচন তখন তার মা বুড়ী রামদেইকে বোঝাচ্ছে কি রকম তার জীবনটা কেটেছে। কাঁদবার কিছু নেই, সে মানুষ হয়ে এসেছে। কথাটা, কথার আড়ে ও চোখ ঠেরে তার বৌ ঝুনিয়াকে জানান দিচ্ছে।

তার মা কান্না ছেড়ে, রাগের অছিলায় অন্যদিকে মুখ করে শুনছে। কিন্তু থুত্‌নি ঝুলে জিভ্‌টা বেরিয়ে পড়েছে তার বিস্ময়ে। রেখাবহুল মুখে পাটের ফেঁসো লেগে দেখাচ্ছে যেন রং ওঠা ময়লা প্রতিমার মুখের মতো। বৌও শুনছে আটা মাখতে মাখতে। ভাইবোনগুলি গালে হাত দিয়ে শুনছে। খালি গা, ন্যাংটো তারা। শীত থাকলেও গায়ে জামা নেই।

শুনছে আরও কিছু জোয়ান ছেলে। বাদবাকিরা শুনছে বটে, কিন্তু যে যার ঘরের দোরে বসে। অনেকের একটা কৌতূহল আছে, ওই মন ভোলানো চামড়ার পেটিটাতে কি আছে। হতে পারে, বানোয়ারীর কপাল ঘুরিয়ে দেবে বেচনের ওই পেটিটা।

কালিকাপ্রসাদ যে খাটিয়াতে বসেছিল, সেই খাটিয়াতেই ঠ্যাং ফাঁক করে পা ছড়িয়ে বসেছে বেচন। বলছে, 'হাঁ, জেহেলকা ডাগডর, ভুখা হরতালকে টাইমমে জোরসে দুধ পিলানে আতা রাহা। তো কেয়সে পিলায়েগা? একঠো রাবারকা নল নাকমে পেটকা অন্দর ঘুসা দেতা-রাহা, ঔর ছুক্ ছুক্ দুধ ডাল দেতা। মগর হমলোগ থোড়াই পিতা। রোজ মারপিট হোতা রাহা।'

এ অভিনব পন্থার কথা শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

একেবারে অবিশ্বাস করল বানোয়ারী। আবার তার রাগটা চড়তে লাগল।

কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই বেচন চট্ করে পকেট থেকে ঝকঝকে পরিষ্কার একটা রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সকলের সামনে মেলে ধরল। সবাই কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিয়ে দেখেই চমকে উঠল। এ যে রক্ত!

বেচন কিন্তু পুরু ঠোঁট উল্টে হেসে বলল, 'ঘাও হো গয়া, শুখা নহি অব তক্।'

এবার বানোয়ারীও সকলের সঙ্গে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছেলেকে। না, খুশি সে কিছুতেই হতে পারছে না। একে তো মরদ হয়ে বেচন গোঁফ জলাঞ্জলি দিয়েছে, যেন অওরতের পালিশ করা মুখ। চৈতন, অর্থাৎ টিকি, সেটাও জেল কোম্পানীকে বিকিয়ে এসেছে আর কথাও বলছে ঠেট হিন্দীতে।

যাই হোক, সারা বস্তির দারুণ কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের মধ্যেই সারাদিনের খাটুনির পর শীতের রাত নেমে এল তার গাঢ় ঘুম নিয়ে। চোখের পাতা আপনি বুজে এল সকলের। এক ইঞ্চিও ফাঁক না দিয়ে ঘুমন্ত মানুষে ঠাসাঠাসি দাওয়া ও ঘর। বেচন জামা কাপড় ছেড়ে, রোজকার জেল জীবনের মতোই পায়জামা পরে, মুখ হাত পা ধুয়ে খেতে বসল। খেতে দিল তার মা আর বৌ।

তারপর রাত্রে শুতে গিয়ে আবার এক কাণ্ড।

ঘরের বাইরেই উনুনের ধারে একটা খাটিয়া পড়েছে বেচনের শোয়ার জন্যে। বাইরের থেকে আড়াল করার জন্যে একটা চট চালার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুনিয়াকে বেচনের সঙ্গে রাত্রে শুতে দেওয়ার ব্যাপারে বানোয়ারীর ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু রামদেই অর্থাৎ মা সেটা হতে দিল না, কারণ মরদ ঘরে থাকলে অওরতের একা শোয়া খারাপ। কেন? না, বরহমদেও কিংবা অন্য কোন অশরীরী জিন-প্রেতের হাওয়া লাগতে পারে। মরদ থাকলে তারা সুবিধে করতে পারে না।

সুতরাং বানোয়ারীর দরজা বন্ধ হল আর ঝুনিয়া বেচারী এক কোণে মুখ ঢেকে পল গুণতে লাগল। ভয়ে সে আজ কিছু মুখে তুলতে পারেনি।

প্রথম কথা, গাওনা করে যেদিন তাকে বেচন নিয়ে এল, যাকে সে তার কিশোরী প্রাণ ও মন সঁপে দিয়েছিল, সেই খোঁচা খোঁচা চুল, হলদে রঙের ছোপানো ধুতি আর কামিজ পরা গাইয়ে বকবকে লোক তো এটা নয়; এর অন্য নাম-ধাম হলেও সে বিস্মিত হত না। অর্থাৎ এর কিছুই সে চেনে না। এমন কি এর গা ও জামাকাপড় থেকে যে গন্ধটা বেরুচ্ছে, সেটাই শুধু অপরিচিত নয়, তার মনে জেগে উঠেছে এক অপরিচয়ের দূরত্ব, ভয় ও কিছুটা বা সমীহ। তারপর খাটিয়ার বিছানাটা এত নরম, ঝকঝকে ও বিচিত্র গন্ধযুক্ত যে, তার জীবনে ওরকম বিছানায় শোয়া দূরের কথা, কাছেও ঘেঁষেনি। সেজন্যে তার শরীরও সিঁটিয়ে রয়েছে।

তা ছাড়া সে শুনেছে একটা দুর্বোধ্য অদ্ভুত বিশেষণ,—লোকটা কিমলিস।

ঝুনিয়ার মনে হচ্ছে, অন্য একটা মরদ তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। কিন্তু বেচনের সে সব খেয়াল থাকলে তো। মানুষের মুক্তির একটা দারুণ আনন্দ আছে। বেচন সেই মুক্তির নেশায় পাগল। সে দিব্যি গুন্‌গুন করছে বিচিত্র সব গানের কলি। কখনো, হৃদয়ের

চাপা আবেগে স্বর বেস্বর হয়ে কেঁপে যাচ্ছে। তারপর সে ঝুনিয়াকে বোঝাতে আরম্ভ করল, সে কি হয়েছে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'ইয়ে জান চলা যায়, তওভি মালিক কা জুলুম খতম করনে হোগা। কেয়সে? না, লড়নে হোগা। ইস লিয়ে লিখাপঢ়ি করনে হোগা জরুর। হমকো জেহেলমে ইউ-পিকে রহনেওয়ালা এক ভারি বাবু বহুত কুছ শিখায়া। হম্ অভি কিতাব পড়নে সাকতা। তুমকো ভি শিখায়েগা।'

বলে সে বড় বড় চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাল হাত মুখ গুঁজে বসে থাকা ঝুনিয়ার দিকে। আবার বলল, 'দুনিয়ামে বহুত অওরত মরদকো সাথ কাম করতা, তুমকো ভি হমহারা সাথ লে লেগা।'

বলে সে ঘাড় সোজা করে দৃপ্ত ঘোষণার ভঙ্গিতে তাকাল ঝুনিয়ার দিকে। কিন্তু ঝুনিয়া একেবারে নিশ্চুপ। এমন কি নড়েও না।

আরও খানিকক্ষণ এসব কথা বলে ঝুনিয়ার দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। তারপর বলল, 'খাটিয়া পর চলা আও, কাহে ওহা বয়ঠা। হম তো নয়া আদমি নহি।'

বলে সে ঠোঁট কুঁচকে হাসল। কিন্তু ঝুনিয়া এল না। বেচন বুঝল, অনেকদিন পর ঝুনিয়ার সরম হচ্ছে। হবেই তো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গাওনার পর সেই স্বল্প দিনের জীবনের মধুর ছবি। প্রেমবতী কিশোরী ঝুনিয়ার সেই অবোধ চাউনি। হাসিতে টলটল, অভিমানে ছল ছল সেই চোখ, টকটকে কথা, ফিকফিকে হাসি, হৃদয় যেন রংবাহারি ঝরনায় একেবারে স্নান করে উঠত। হ্যাঁ, জেলে থাকতে ওই মুখ মনে করে তার বিনিদ্র রাত্রি নিঃশব্দে বোবার মতো গুমরে মরত। খাঁ খাঁ করত বুকের মধ্যে আর নিশীথে প্রহরীর বুটের শব্দ বিঁধত হৃৎপিণ্ডে। তখন মুক্তির জন্যে পাগল

হয়ে উঠত সে। সমস্ত বাইরের জীবন তাকে তখনি ডাকত হাতছানি দিয়ে। সে সব ভুলে অন্ধকার সেলের মধ্যে অভিশপ্ত অশরীরীর মতো চার দেওয়ালের দিকে দিশেহারা চোখে তাকাত।

আজ সে মুক্ত। আজ সে বস্তিতে। মন তার আজ সাফ হয়ে গেছে। আর ওই তো ঝুনিয়া। ভাবতে ভাবতে কি হল জানি না, বোধ হয় আবেগ-অন্ধ ভালবাসায় নিজেকে আর সামলে রাখা দায় হল তার। সে আরও কয়েকবার ডেকে যখন সাড়া পেল না, তখন হাসতে হাসতে গিয়ে হাত ধরে টান দিল।

ঝুনিয়া ওই সব লেখাপড়া ও বেচনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে যাওয়ার বক্তৃতা শুনে ভয়ে এমনিতেই নিঃশব্দে কাঁদছিল। এবার হাত ধরতে ভয় তার দ্বিগুণ হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে নিশ্বাস তার আটকে এল।

কিন্তু বেচন সেটা বুঝল না। অন্ধ প্রেমাবেগে ঝুনিয়াকে দু-হাতে সাপটে ধরে তার মুখে একটা চুমু এঁকে দিল।

কিন্তু বিপাকে ব্যর্থ ঝুনিয়ার গলা দিয়ে রুদ্ধ কান্নাটা আচমকা হাউমাউ শব্দে বেরিয়ে এল। কেননা, লোকটা যে এমন আচমকা তাকে এরকম করবে, এটা সে মোটেই ভেবে উঠতে পারেনি।

কান্না শুনেই ঘরের ভেতর থেকে বানোয়ারী, 'কা ভইল, কা ভইল' বলে চিৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে রামদেইয়ের গলাও। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকেও লোকজন চড়া গলায় সাড়া দিয়ে উঠল, জেগে উঠল বস্তি। এরকম হঠাৎ শব্দে কুকুরগুলিও ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

বেচনের হাত পা এলিয়ে পড়ল। আর তার মুখ দিয়ে খালি বেরিয়ে এল, 'হাই লাও!'

এই 'হাই লাও' কথাটাই একমাত্র ঝুনিয়ার পরিচিত। ওই একটা

কথাতেই সে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যে, এ বেচন সে বেচনই আছে।

কিন্তু ততক্ষণে বানোয়ারী বেরিয়ে এসেছে। রামদেইও এসেছে, তা ছাড়া অন্যান্য দু-চারজন।

সকলের প্রশ্নের সামনে বেচনকে মনে হল যেন অপরাধী ধরা পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু বোকার মতো হেসে সে বলে ফেলল, 'ইয়ে ডর গয়ি।'

তখন বানোয়ারী দুষল রামদেইকে, 'তুমকো হম কেয়া বোলা? এ লেড়কা কেয়া না কেয়া বনকে আয়া, তো অওরত কেয়সে রহেগা?'

রামদেই বুঝল অন্যরকম। সে খিঁচিয়ে উঠল বানোয়ারীকে, 'ওইসা হোতাই করতা। জিন্দিগীভর ইস্‌কো ইয়ে মরদকো সাথ রহনে পড়েগা কেয়া নহি? মরদ যো ভি হো, কিমলিস্ হো, ডাকু হো ইয়া চুহা হো। ছোড়ো, তুম ঘর চলা আও।'

বলে সে বানোয়ারীকে নিয়ে ঘরে চলে গেল। অন্যান্যেরা কৌতুকের চেয়েও বেশী বিস্ময় নিয়েই ফিরে গেল।

ঝুনিয়া দাঁড়িয়ে রইল তেমনি, মুখ ঢেকে। সে এখন নিঃশব্দে কাঁদছে। ব্যাপারটার জন্যে নিজেকে অপরাধী ভেবে সে বড় অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে যে নিরুপায় হয়েছিল।

আর বেচন। অভিমানে বুক ভরে উঠল তার। মহব্বত ভুলে গেছে ঝুনিয়া। বেজায় মন খারাপ করে সে শীতের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে আসতেই আবার তার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। কত-দিন বাদে সে আবার নিশীথ রাত্রে আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছে। বস্তির পুরনো কুকুরটা তাকে ঠিক চিনে এসে গায়ে পড়ছে, পা চেটে আদর কাড়াচ্ছে। ওই তো গঙ্গা, একটা অদৃশ্য গহ্বর থেকে যেন ধোঁয়ার

মতো কুয়াশা উঠছে। ওই তো শহরের বড় রাস্তার বিজলী বাতি, কারখানার চিমনি। মনে মনে বলল, 'সব ঠিক হো যায়েগা, হাঁ!' ঝুনিয়া, বাপ-মা, পড়শী আর কারখানার মজুর, সব ঠিক হয়ে যাবে। কী করে? না, বেচন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ওই এক চিন্তায় সে মশগুল হয়ে রয়েছে। জীবনে এখন তার একটাই কর্তব্য, যেমন করে হোক, একটা খাঁটি কামনিসের মতো মজদুরদের জিন্দিগী বদলে দিতে হবে। সে কামনিস হতে চায়। কেননা সঠিক না বুঝলেও একটা বিচিত্র ঝাপসা শুভদিনকে সে কামনা করছে।

কিন্তু এর পরে সকলের কাছে সে এবং তার কাছে সকলে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পরদিন ভোরবেলা যখন সে টুথপেস্ট ও ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজছে, কারখানায় বেরুবার মুখে বাপের সঙ্গে তার আবার ঝগড়া লাগল। শুধু বাপ কেন, সারা বস্তির লোক হাঁ করে তাকিয়ে তার রাজকীয় কায়দায় দাঁত মাজা দেখল। তাদের মতো মানুষেরা চিরকাল ছাই দিয়ে নয়তো দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজে। আর এ যে বুরুশ। বানোয়ারী বলে গেল, 'বিলাইতি বুরুশসে দাঁত বানাতা! ঠাহ্‌র যা শালা কারখানাসে আ কর—'

বেচন এসব কথায় কানই দিল না। সে যেমন কাল সকালেও দাঁত মেজেছিল, তেমনি মাজতে লাগল। বরং মনটার মধ্যে নেই বন্দী জীবনের অবসাদ।

যাই হোক কারখানা থেকে এলেও সেদিন এবং আরও কয়েকদিন ঝগড়া বিবাদটা চাপা রইল কারণ বেচন এক জোড়া নতুন ধুতি তার বৌকে আর মাকে দিয়েছে, বাপকে দিয়েছে একটা ধুতি আর কামিজ। তাছাড়া খান তিনেক আস্তো কামিজ ও পায়জামা দান করেছে সে

তার সমবয়সী বস্তির বন্ধুদের। অবশ্য তারা সকলেই স্পিনার, পুরনো সহকর্মী।'

এতেও বানোয়ারী বলতে ছাড়ল না, 'বড়া তালুকদার আইলান। আধা পয়সাকে বাচ্চা নহি, চাঁদিকা বাপ্ বন্‌তা হ্যায়।' শোনা যায়, বেচন হয়তো তখন ঠ্যাং ফাঁক্ করে দাঁড়িয়ে কাউকে বোঝাচ্ছে, 'হাঁ হাঁ, ভাই হম্ বোল্‌তা, ইস্ ঘড়ি মজদুরকো রাজ জরুর হোনা চাহিয়ে। আঁ? কেয়সে? আচ্ছা, ঠাহ্‌রো।'

বলে কখনো তার জেল থেকে নিয়ে আসা তিনটে কেতাব ঘাঁটতে বসে নয়তো বলে, 'আচ্ছা কাল বাতায়েগা।'

কিন্তু কিছু একটা বাতলায় ঠিকই তার পরদিন। তার শ্রোতারা অবশ্য দু-একবার বড় বড় জলসাতে, ওই 'মজদুর রাজ' কথাটা শুনেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনি। ভেবেছে উপর থেকে একটা কিছু হতেও পারে। কিন্তু বেচনের মুখ থেকে কথাটা শুনে সত্যি তারা বিস্মিত হয়। সংশয় ও অবিশ্বাস্য রকমের একটা ভাবের উদয় হয় তাদের। কেউ কেউ শ্রেফ হাসে, গালাগাল দেয় কেউ কেউ। অর্থাৎ বেচনের প্রতি দু-চারজনের মনে রীতিমত সম্মান আছে। বেশী সংখ্যক সংশয়ান্বিত, অনেকে ভীত আর অবিশ্বাসী, আবার বিদ্বেষীও কিছু কিছু আছে।

তারপর এসব জামা কাপড়ের ব্যাপার না মিটতেই বেচনের দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তেল, সাবান, চুল-গোঁফহীনতা ও পোশাক নিয়ে নিত্যই বানোয়ারীর সঙ্গে মারামারির উপক্রম হতে লাগল। এর একটা চূড়ান্ত ঘটনা ঘটল সেদিন, যেদিন বেচন পাতলুন আর কামিজ পরে একেবারে কারখানার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এমন কি সে ডিপার্টের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। খবর পেয়ে গোরা ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, কালা লেবার অফিসর, বড় সর্দার আর দুটো দারোয়ান একযোগে তাকে

তাড়া করে এল। সে যত তাদের বোঝাতে যায়, 'সিরিফ মোলাকাত করনে আয়া' কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না। তখন সে রেগে চিৎকার করে জানিয়ে দিয়ে এল, কিন্তু বাইরে সে মোলাকাত করবেই। এই বেইমান ম্যানেজার সাহেব তাকে ধোঁকা দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল, এর জন্যে একবার তাকে সাজা জরুর নিতে হবে। ততক্ষণ তাকে ঠেলে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে।

কালিকাপ্রসাদ বানোয়ারীকে খালি টুকে দিল, 'কেয়া বোলা রহা হম? তুমহারা লেড়কাকো ঘরসে ভাগানে হোগা। নহি তো বড়ি হুজ্জৎ মচেগা।'

বানোয়ারী বস্তিতে ঢুকেই প্রথমে পট করে ভেঙে ফেলল বেচনের টুথব্রাশটা। তেলের শিশিটা ফেলতে গিয়ে দেখল তেল নেই। তবু ফেলে দিল। ফেলে দিল সাবানের বাক্স। তারপর হাতের কাছে চট করে কিছু না পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কাঁহা গয়া, লে আও শালা জেহেলকা বাচ্চাকো।'

কিন্তু সেই জেলের বাচ্চা, তখন কোম্পানীর লাইনের মজুরদের বলছে, 'দেড় সাল কেয়া, জিন্দিগী ভর রহনে সাকতা জেহেলমে, মগর কামিয়াব হোনা চাহিয়ে।'

তারপর বস্তিতে ঢুকতে না ঢুকতেই বানোয়ারী তাকে তাড়া করে এল। কিন্তু গায়ে হাত তুলতে গিয়েই থমকে গেল এবং ঘুষি বাগিয়ে মার খাওয়ার জন্যে ডাকতে লাগল।

বেচন শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'দিমাগ ঠিক রাখো। কাহে? না, তুম মজদুর হো।'

রাগের চোটে অজ্ঞান হয় আর কি বানোয়ারী। শেষটায় চামড়ার সুটকেশটা টেনে এনে বেচনের পায়ের কাছে দিয়ে বলল, 'অভি

নিকলো, নহি তো দেখেগা কেতনা বড়া কিমলিস্ বনা।'

কিন্তু বেচন অপ্রতিভ অথচ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বলল, 'আচ্ছা, থোড়া দিন বাদ চলা যায়েগা।'

টুথব্রাশ কিংবা তেল এসব নিয়ে বেচনের ভাবনা ছিল না। কেননা, খালি ব্রাশ থাকলে তো হবে না, মাজন চাই। কিন্তু পয়সা নেই। সুতরাং তেল সাবান মাখা তার এমনই বন্ধ হয়ে গেল। জামা কাপড়ে সাবান না পড়ে সেগুলিও ময়লা হয়ে গেছে। চাকচিক্য কমে গেছে তার। এমন কি, ব্লেড নেই, পয়সা নেই, তাই গোঁফও রীতিমত কামানো হয় না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি এখন প্রায় সব সময়েই তার মুখে দেখা যায়। একটা কাজের খোঁজে সে রোজই এদিকে ওদিকে যায়। কিন্তু এখানকার কোন কারখানা তাকে কাজে নিতে রাজী নয়। সেই এক কথা, কামনিস্।

শরীরটাও তার ভাঙতে আরম্ভ করেছে। কোটরে ঢুকেছে চোখ। তাহলেই বা কি। সে ঠিক দুপুর বেলা নিয়মিত ওই কেতাব তিনখানি নিয়ে বসবে, আর বাচ্চা পড়ুয়ার মতো চেঁচিয়ে পড়বে: দুশমন হরবখত নজর রাখতা হ্যায় কি হমারা সংগঠন কি ক্রুপ কাঁহা ঢিলা হ্যায়। জেয়সে কি বামপন্থা ঔর দকছিন পন্থা—

থামতে হয়। বাম ও দক্ষিণের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে গণ্ডগোল পাকায়। ছোটে নারাইন্‌বাবুর কাছে। তিনি নাকি কামনিস্। কিন্তু যা বলেন, বেচনের মাথায় তার চার ভাগের এক ভাগও যদি ঢোকে। সুতরাং কিছুটা তাকে মনগড়া ভাবতেই হয়।

কেতাব তিনখানি ছাড়া তার সুটকেশে কাগজ চাপা আরও দুটি বস্তু ছিল। একটি হিমানীর নতুন কৌটো আর একটা পাউডার। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই গোপনীয়। বস্তু দুটি সে ঝুনিয়ার জন্যে রেখেছিল। কিন্তু

ঝুনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের সন্ধি আজও হয়ে ওঠেনি। অবশ্য কান্নাকাটি সে আর করে না। কিন্তু সে ভালবাসা আর নেই। সে দেখে, ঝুনিয়া একেবারে নিস্পৃহ, বরং তার বাপ মায়ের কথা শুনে শুনে, বেচনের উপর যেন বিরক্ত। এমন কি একদিন বলেও ফেলেছিল, 'কাহে তু কিমলিস্ বন্ গেইলান?' বোঝাতে তো বেচন পারেইনি, উপরন্তু ঝুনিয়া আরও দূরে সরে গেছে। বস্তু দুটি বেচন তাকে দিয়েছিল সে নেয়নি। বলে দিয়েছে, মরে গেলেও ওসব সে মাখতে পারবে না কেননা ততখানি খারাপ অওরত সে নয়। প্রেম অথবা বিরহের বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই বেচনের, তাই চুপ করে থাকে। আর বুকের মধ্যে তার টনটন করে। কিন্তু সে টনটনানির অনুভূতিটা তার কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়।

যাক, এখন কাজ খোঁজা আর পড়া এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর লাইন ও বস্তিতে গিয়ে সবাইকে তার কথাটা বলাই একমাত্র কাজ।

ইতিমধ্যে শীত চলে গেছে। বসন্তও বিদায় নিয়েছে। গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রোদে আকাশ মাটি তেতে রয়েছে। সব জ্বলছে। এখনো জ্বলছে গঙ্গার ধারে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল।

এতদিন পরে একটা কাজ পেল বেচন। লালা সাহেবের কুড়িটা রিক্সা-ওয়ালাকে রোজ খুঁজে খুঁজে পয়সা আদায় করার কাজ। ভালো কাজ। দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু হলে কি হবে। রিক্সাওয়ালাদের সে বোঝাতে আরম্ভ করল, লালা সাহেব তাদের সিরিফ ঠকাচ্ছে, তারা সবাই একদিন লড়ে যাক। কথাটা লালা শুনেই তাকে বিদায় করে দিল।

তারপরে এক বড়লোকের গদিতে তার চাকরের কাজ পেল। সেই বড়লোকটি মাতাল আর রসিক। এমন কি সে বেচনের সঙ্গেও

রসিকতা করত। সুযোগ বুঝে বেচন তাকেও জেলের কথা এবং মজদুর রাজ বোঝাতে গেল। ব্যস্! মাতালের রসপূর্ণ ঢুলুঢুলু চোখ একেবারে ছানাবড়া। ভাবল, বুঝি বরবাদ হল তার গদি। গেল কাজটা।

দেখে শুনে বানোয়ারীর আর সহ্য হচ্ছিল না। বেচনের লাইনে বস্তিতে যাওয়া নিয়ে কালিকাপ্রসাদ তাকে রোজ মুখ খিঁচোয়, ভাগিয়ে দিতে বলে।

বানোয়ারীর মাথার ঠিক থাকে না। সবচেয়ে রাগ হল তার ওই কেতাব তিনটের উপর। চাবি লাগানো সুটকেশ ভেঙে সে একদিন বার করে ফেলল কেতাব তিনটে। নিজে পড়তে পারে না, নিয়ে গেল কালিকাপ্রসাদের কাছে। কালিকাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ বটে, সেও পড়তে জানে না। চৌরাস্তার মোড় থেকে ডেকে নিয়ে আসা হল নারদ পণ্ডিতকে।

নারদ পণ্ডিত দেখল, একটা বইয়ের নাম, 'কমিউনিজম্'। ভেতরে একটা দাড়িওয়ালা লোকের ছবি, নীচে লেখা রয়েছে 'ঋষি কার্ল মার্কস্'। আর একটা বইয়ের নাম, 'মার্কস্‌বাদী শিক্ষা'। ভেতরে ছোট ছোট দাড়ি ও গোঁফওয়ালা, টাকওয়ালা মানুষের ছবি। চাউনিটা চোখা। নীচে লেখা 'মহামতি লেনিন'। তৃতীয়টা 'ভুখা মজদুর' লেখক—'রামনরেশ গুপ্তা'।

দেখেই নারদ পণ্ডিত বই কটা বিষবৎ মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'ইয়ে ছুঁনেসে পাপ হোতা। তুমহারা লেড়কা একদম জাহান্নমমে গয়া।'

কালিকাপ্রসাদ বলল, 'পণ্ডিত, কিমলিস্ কিতাব হ্যায় না?'

পণ্ডিত বলল, 'উস্‌সে ভি খারাপ।'

বানোয়ারীর তো গায়ে কাঁটা দিল। বলল, 'কেয়া, মুসলমানি কিতাব?' ছবিগুলি দেখে ওইরকম অর্থই সে করেছে। পণ্ডিত বলল, 'উস্‌সে ভি খারাপ। ঈশ্বর কো গালি লিখা হ্যায়। লেড়কা একদম বিগড় গয়া।'

আর বলার দরকার ছিল না। রাগে গোঁফ ফুলিয়ে বানোয়ারী বই কটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর হাঁটু মুড়ে বসল যেন সে এতদিনে সত্যিই বেচনকে শায়েস্তা করেছে।

ব্যাপারটাতে দু-একজনের আপত্তি ছিল। কিন্তু পণ্ডিত আর কালিকা-প্রসাদের সামনে বলতে সাহস পেল না।

সে সময়েই এল বেচন। একমুখ দাড়ি, নোংরা পাতলুন, ছেঁড়া জামা। মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছিল সে :

একবার হো খাড়া হিম্মতসে
কিস্মত লুটো দুনিয়াসে।

কিন্তু লোকজন দেখে থেমে গেল। তারপর ব্যাপারটা বুঝে সে কিন্তু ক্ষেপল না। ছেঁড়া কাগজগুলি দেখিয়ে বানোয়ারীকে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন্ ফাড়া, তুম?'

বানোয়ারী একটা হাতাহাতির আশঙ্কায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাঁ, তুমহারা বাপ।'

'ইয়ে তো সহি বাত।' বলে বেচন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র গম্ভীর গলায় হাত নেড়ে নেড়ে বলল—'তুম গলতি কিয়া। কাহে, না মজদুর কো এক বহুত হামদরদী, এক মহাক্রান্তিকারকো কিতাব তুম ফাড় দিয়া। দেখো আজ দুনিয়ামে—'

বানোয়ারী চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপ। চোপ রহো।'

বেচন তখন নারদ পণ্ডিতের দিকে ফিরে হাত জোড় করে নমস্তে জানিয়ে বলল, 'পণ্ডিতজী শুনিয়ে, আপ সমঝিয়েগা।'
পণ্ডিত লাফ দিয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'খবরদার, সমঝায়গা তো আচ্ছা নহি হোগা, হাঁ।'
বেচন অবাক হয়ে বলল, 'হাই লাও!'
বানোয়ারী ভেংচে বলল, 'কেয়া লেগা রে? তু পণ্ডিতজী কো সমঝানে মাংতা? অভি নিকলো শালা, নিকলো।'
'শালা' কথাটার প্রতিবাদের ইচ্ছা থাকলেও করল না বেচন। কেননা সে ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। কিন্তু এ সময় খেতে চাইলেও পাওয়া যাবে না। সে তার কোটরগত বুভুক্ষু চোখে তাকিয়ে দেখল, ঝুনিয়া রুটি সেঁকছে। রুটি সেঁকতে সেঁকতে ঝুনিয়া এদিকেই তাকিয়েছিল। বেচনের চোখ পড়তেই, চোখ সরিয়ে নিল সে।
আর কোন কথা না বলে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেচন ধীরে ধীরে চলে গেল। এবং সত্যিই কিছুদিন বস্তিমুখো হল না। তার কারণ ছিল। কারখানায় জনা চল্লিশ লোককে ছাঁটাই করার কথা চলেছে। সে গিয়ে সেখানে ভিড়েছে। তাদের নিয়ে পড়েছে। শিউপুজনবাবু, কামতাপ্রসাদ, নওরিনবাবুও এসেছেন। তা হলেও বেচন ব্যাপারটাকে তো আর এমনি ছেড়ে দিতে পারে না।
ছাঁটাইয়ের মধ্যে তাব মায়ের নামও ছিল। সে জন্যে সে একদিন পথে তার মাকে ধরেছিল, ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে। কিন্তু বানোয়ারী তাকে ইট নিয়ে তাড়া করেছিল। বলেছিল, 'শালা, কিমলিসপনা দিখানে আয়া?' ফের শালা শুনে খানিকটা অভিমান করেই চলে গিয়েছিল বেচন।
এখন বেচনের চেহারাটা হয়েছে যেন ভবঘুরে পাগল ও ক্ষুধার্ত

ভিখিরির মতো। বিশ্বাস করাই দায়, একদিন শীতের সন্ধ্যায় সে বেশ ফিটফাট ধোপদুরস্ত হয়ে এসেছিল। তার দোস্ত ইয়াররা অবশ্য তাকে খাওয়ায়, যেমন চা আর পান। কোন কোন সময় দুটো লেড়ো বিস্কুট কিংবা দু-পয়সার মুড়ি।

কিন্তু ব্যাপারটা এমনিই যে গত রেশন স্ট্রাইকের সাফল্য এবং তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

কিন্তু শ্রমিকরা সব সময় তার কথা শোনে না অবশ্য বেচনকে তারা একেবারে ফালতু মনে করে তাও নয়। তবে শিউপুজন কিংবা নওরিনবাবু অর্থাৎ নরেনবাবুর বুদ্ধির কাছে কোম্পানী হার মানলেও মানতে পারে।

বেচন এখানে সেখানে মজুরদের ধরে ঠেট হিন্দীতে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কেয়া, তুমলোগ মধ পিনে মাংতা ইয়া নহি? মাংতা? তব, ইয়ে ভি খেয়াল রাখো, ছত তোড়নে হোগা, তকলিফ উঠানে হোগা, সমঝা?'

বোঝাতে গিয়ে অনেকে দুর্বোধ্য নজরে চেয়ে থাকে। কেননা আর যাই হোক, মৌমাছির হুল্ যদি জেল কোম্পানীর গেট হয় তাহলে তো বড় ফ্যাসাদ। তা সে জেল থেকে বেচন যাই হয়ে আসুক। সুতরাং ভয়ও হয় তাদের।

কখনো দেখা যায়, নওরিনবাবু বা কামতাপ্রসাদের সঙ্গে সে রীতিমত তর্ক জুড়েছে এবং হঠাৎ 'আজ দুনিয়ামে মজদুর লড়াইকা রাস্তা' দেখাতে শুরু করেছে।

ওদিকে কালিকাপ্রসাদ তো রোজই বানোয়ারীকে ধম্‌কাচ্ছে যে, সে যেন অবিলম্বে তার ছেলেকে এলাকা থেকে বার করে দেয়। বার

করবে কি করে? হারামজাদাকে তো সে কাছেই পাচ্ছে না। আর স্যুটকেশ ও বেচনের ময়লা হয়ে যাওয়া বিছানা ছাড়া প্রতিশোধ তোলার আর কোন বস্তুই নেই।

এদিকে একদিন সকাল বেলা গণ্ডগোল লেগে গেল। যাকে বলে হৈ হৈ পড়ে গেল। অর্থাৎ ছাঁটাই নোটিস জারি হয়ে গেছে।

বেচন তখন রেল সাইডিংএর গুমটি ঘরের বারান্দায় ঘুমোচ্ছে, যেন রাতজাগা লোম ওঠা ক্ষুধার্ত একটা নেড়ি কুকুর।

সাইডিংএর গেটম্যান রামু তাকে ডেকে বলল, 'কা হো মহারাজ, আজ দুনিয়ামে ছাঁটাই নোটিস গির গয়া।'

'হাঁ।' বেচন লটপট করতে করতে কারখানা গেটের কাছে এসে হাজির। কিন্তু কারখানার গেটের কাছে কেউ নেই।

বেচন উঁকি দিতে গেল, দারোয়ান তেড়ে এল।

সে বারকয়েক পায়চারি করে মাথা নেড়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন তার বৌ প্রসব ব্যথায় ভেতরে কাত্‌রাচ্ছে আর সে ছটফট করছে অকর্মার মতো।

একটু পরেই শিউপুজনবাবু কারখানা থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বেচন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভীষণ ব্যস্তভাবে সে অন্যদিকে পা চালিয়ে দিল। এ তো বড় মুশ্‌কিল! তা হলে কিভাবে কাজ হবে?

তারপর টিফিনের সময় মজুররা সব বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গেই বেরিয়ে এল চল্লিশজন ছাঁটাই মেয়ে ও পুরুষ। তার মধ্যে বেচনের মা-ও ছিল। তারা সব বুক চাপড়ে কোম্পানীর পিতৃ-পিতামহ তুলে গালাগাল দিচ্ছে।

বেচন মনে মনে বলল, 'ইয়ে বুজদিললোগ কাহে গালি বকতা?'

সে একে তাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু কেউই তার কথায় কান দিচ্ছে না।

তখন সে কারখানার সামনে, মাইল পোস্টের ছয় ইঞ্চি জায়গার উপর কোন রকমে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আরে ভাগতা কাঁহা তু লোগ? আঁ, হমকো পহ্‌চানতা নহি?'

চেনে বৈ কি। কিন্তু চিনে কি করবে? জনারণ্যের স্রোত বেরিয়েই চলল। বেচন একবার বলল, 'হাই লাও।' সংকীর্ণ জায়গায় তার পা ছুটো টলে গেল। তারপর আবার সোজা হয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'হম বেচন। হম্‌ বোলতা, তুলোগ ঠাহ্‌র যা। ছাটাই জরুর বন্দ্‌ করনে হোগা। দেখো ভাই, তুলোগ মজদুর হ্যায়। তেরা তাগদ ম্যানেজারসে জায়দা হ্যায়। হাঁ, আজকে দুনিয়ামে…'

জনারণ্যের স্রোত দ্বীপের মতো এখানে ওখানে থমকে গেল। ভিড়ের মধ্যে বানোয়ারীর হাত নিসপিস্‌ করছে। শুয়ারের বাচ্চাটার চুলের মুঠি ধরে না নামালে চলবে না দেখ্‌ছি। খুব কিম্‌লিসপনা হচ্ছে। হারামজাদার পকেটে বোমা নেই তো?

বেচন বক্তৃতা ছেড়ে মাঝে একবার বলে উঠল, 'নাথুনি, মত্‌ যাও। কাহে? না, তু এক বুঢ়া মজদুর।'

কামতাপ্রসাদ আর নওরিনবাবু দূর থেকে তাকে তারিফ করছে, এটা বেচন দেখতে পেল। ফলে তার গলা আরও চড়ল। সে এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। পা বদলে বলল, 'হম বেচন, জেহেলমে গয়া। কাহে? না রেশনকা হরতাল কিয়া। তু লোগ উস্‌ বাত্‌ ভুল গয়া?'

এক পশলা বৃষ্টির পর কাঠফাটা রোদে সবাই নাক-মুখ কুঁচকে, দাঁত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবাই ঘিরে ধরেছে তাকে। সে ঘামছে। গায়ের মধ্যে কি যেন কুটকুট করছে।

কিন্তু সব ভুলে সে বলেই চলল, 'উস্ ঘড়িকে বাত ইয়াদ করো। ছাঁটাই নোটিস আপিসকে টেবিল পর জমা কর্ দো। কাহে? মজদুর তু খানা বিনা মর জায়েগা তো জমানা কৌন বদলেগা!'

একটা সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠল। বেচন ঘাম মুছে আবার বলবার উপক্রম করতেই কি একটা ঘটে গেল। সবাই শুনল, একটা চাপা আর্তনাদ 'হাই লাও!' আর ঠিক একটা কাটা কলা গাছের মতো বেচন ঝরে পড়ল মাইল পোস্টের গায়ে।

চারদিকে একটা রব উঠল, 'খুন খুন হো গয়া।' অনেকে পালাতে লাগল কেউ কেউ দিকভুল করে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কিন্তু রামদেইয়ের বিকট চিৎকার একটা স্তব্ধতা এনে দিল। বুড়ী রামদেই ছুটে এসে বেচনকে তার কোলে টেনে তুলে নিল। বেচনের তখন চৈতন্য নেই, সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ফাটা মাথায় রক্তের ফিনকি ছুটেছে। রামদেইয়ের রেখাবহুল মুখটা কুঁচকে আটার দলার মতো ছোট হয়ে এল আর অন্ধ হয়ে গেল চোখ। বলল, 'ইয়ে তু কেয়সা বুজদিল কিমলিসোয়া বন্‌কে আয়া, আঁ? জেহেল কোম্পানী তুঝকো কেয়া বনা দিয়া।'

যাই হোক, কামতাপ্রসাদ বলল, 'ডাক্তারখানায় যেতে হবে।'

বানোয়ারী অবাক বোকার মতো দাঁড়িয়ে তার বৌ আর ছেলের দৃশ্য দেখছিল। তাকে খেঁকিয়ে উঠল রামদেই, 'আরে এ বুজদিল বুড্‌ঢা, তু খাড়া হোকে কা দেখতা, বেটাকো উঠাও।'

কাকে? বেচনকে? যেন এ অভাবিতপুর্ব কথা বানোয়ারী কখনো শোনেনি। এমন কি তার লজ্জা হতে লাগল। তবু দু-হাতে তুলে নিল বেচনকে।

তারপর ডাক্তারখানা থেকে মাথা সেলাই করে বেচনকে নিয়ে বস্তিতে

এল তারা। তাদের সঙ্গে অনেক লোক, তারা কেউই আজ কারখানায় যায়নি।

কালিকাপ্রসাদ দেখল এততেও কিছু হল না। তখন সে বানোয়ারীকে ডেকে খেঁকিয়ে উঠল, 'কেয়া, তুম ভি কিমলিস বন্ গয়া ?'

বানোয়ারী বলল, 'আরে রাম রাম।'

কালিকাপ্রসাদ বলল 'রাম রাম কেয়া! উস্‌কো কাহে লে আয়া ?'

বানোয়ারী অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকে চাপা গলায় বলে ফেলল, 'বাবু-সাহেব যো কুছ হো হম তো কিমলিসকা বাপ হ্যায়...'

কালিকাপ্রসাদের রাগের চোটে কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। বুড়োটার মনেও এই ছিল ?

গল্প যদি কিছু বলা হয়ে থাকে, তবে তা এখানেই শেষ। তবু আইন ভঙ্গ করে আর দুটি কথা লিখছি।

রাত কিছু হয়েছে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর মেঘলা ভাঙা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দিক দিগন্তে। বর্ষার গঙ্গা জোয়ারের তীব্র স্রোতে ছুটে চলেছে উত্তরাভিমুখে। গঙ্গা যেন ঝকমকে সোনার পাত।

বস্তিতে অনেক লোক এখানে সেখানে তখনও বসে আছে। তারা খবর পেয়েছে যে কোম্পানী আপাতত ছাঁটাই বন্ধ করেছে। কিছুক্ষণ আগেই বেচনের জ্ঞান হয়েছে। তার কাছে বসে আছে পাশাপাশি রামদেই আর বানোয়ারী। মাটিতে শুয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-গুলি। অদূরে ঝুনিয়া চোখে জলের দাগ নিয়ে বিহ্বলভাবে বসে আছে। পিঙ্গলবর্ণের ভেঙে পড়া খোঁপা ও ময়লা ঘাড়ের কাছে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। রামদেইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তু কিত্‌না বড়া কিম্‌লিস্ বন্ গয়া! তু চলা

যানেসে, কিস্‌কা যায়েগা। ইয়ে রামদেইকা কি নহি?’

বানোয়ারীর গলাটা কেঁপে উঠল কথা বলতে গিয়ে। তবু যুক্তিপূর্ণভাবে উত্তর দিল, ‘হমকো তুমহারা সাথ জোড় লেও। উসকো কেয়া বোল্‌তা, হাঁ হম্‌তো কিমলিসকে বাপ বন গয়া! আরে রাম রাম।’ গলার স্বরটা যেন টুপ করে ডুবে গেল অতলে।

বেচন কথা বলতে গেল। কিন্তু পারল না। তার বুকের কাছে কি যেন ঠেলে এল, আর চোখ দুটো ভিজে উঠলো। এটা যে কি ব্যাপার, সেটা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই বেচন বলে ফেললে, ‘অভি কাঁহা বন্‌ চুকা। কোই রোজ বন্‌ যায়েগা।’

বলে সে দেখলে ঝুনিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর খাটিয়ার উপর বেচনের বুকের কাছে হাতটা এসে পড়েছে। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখল বেচন, ঝুনিয়ার ময়লা গায়ে মুখে গাদা গাদা কি সব লেগে রয়েছে চুনের মতো। ও! হিমানীর কৌটোটা বোধ হয় সবটুকু মেখেছে আর তারই গন্ধ বেরুচ্ছে। বেচনের মুখ থেকে আর কথাই বেরুল না।

অনেকক্ষণ পর সে বলল, ‘দেখো, আজকালকি দুনিয়ামে এক মজদুর আওরত রোনেসে—’

বানোয়ারী বলে উঠল, ‘ব্যস্‌ করো। বিমারকে টাইমমে উসব বাত নহি বোলেগা, বোল্‌ দেতা হ্যায়।’

বেচন বাধা পেয়ে বলল ‘হাই লাও!’

কথাটা শুনে ঝুনিয়ার কান্না দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কেননা আজ আর তার কোন সন্দেহ নেই। অবাক জ্যোৎস্না রাত মায়ের মতো কেমন যেন বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।